Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা আক্তার

রোলঃ ২২৮০২০০১৯২৩১০


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা আক্তার

রোলঃ ২২৮০২০০১৯২৩১০

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিনা আক্তার, আইডিঃ ২২৮০২০০১৯২৩১০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাবিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**সাবিনা আক্তার**

আইডিঃ ২২৮০২০০১৯২৩১০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


সুচনা:.....5

১. সামাজিক অবক্ষয়ঃ.....5

❁ ২. পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ❁ .....22

❁ ৩.প্রযুক্তির অপব্যাবহার ❁.....26

❁ ৪.পাশ্চাত্যের কালচার প্রভাব ফেলেছে❁ .....31

❁ ৫. সমকামিতা ❁.....34

❁ ৬.নারী অধিকার❁ .....41

❁ ৭.মানসিক চাপ❁.....48

❁ ৮.মুজুদদারী ও বাজার সিন্ডিকেট❁ .....52

❁ ৯.নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ❁.....55

❁ ১০.তাকদীরে যেহেতু লেখাই আছে তাহলে চেষ্টা- তদবিরের কি প্রয়োজন?,❁ .....58

❁ ১১.চিন্তা ও পেরেশানী❁ .....62

❁ ১২.আমার মনে কুমন্ত্রণা কেন আসে❁ .....67

❁ ১৩.আধুনিক ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নানা দিক❁ .....72

❁ ১৪.বর্তমান চিকিৎসা ব্যাবস্থায় কিছু সমস্যা এবং তার ইসলামি সমাধান ❁.....78

❁ চিকিৎসা ক্ষাতে এহেন পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের উপায়❁ .....81

উপসংহার.....86

# সুচনা:

আধুনিক যুগে মানবজীবন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে অনেক এগিয়ে গেলেও নৈতিকতা, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নানা সংকট দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সুষম ও কার্যকর সমাধান প্রদান করে। ইসলামের শিক্ষা মানুষের জীবনে ন্যায়, শান্তি, সাম্য ও মানজবকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মানব জীবনকে অনেক সহজ করেছে তা সত্য। কিন্তু সেই সাথে নানান আধুনিক সমস্যা ও অসামঞ্জস্যতাও তৈরি হয়েছে মানব জীবনে। সেই সকল সমস্যারই কিছু সামান্য নমুনা আমরা সামনে তুলে ধরবো এবং তার ইসলামী সমাধান নিয়ে আলোচনা ইংশা-আল্লাহ ।

# ১. সামাজিক অবক্ষয়ঃ

আদিকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করছে। সময়ের পরিবর্তনে সামাজিক আধুনিকায়নের ফলে সমাজে নানা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সেই সাথে অনেক অবক্ষয় ও ঘটেছে । তারই কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হলো।

## ১.১ নৈতিকতা -

বর্তমান সমাজে নৈতিকতার চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং গভীর অবক্ষয়ের সম্মুখীন। একদিকে প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অন্যদিকে মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়—এই দুই বিপরীতমুখী বাস্তবতার মধ্যে আমাদের সমাজকাঠামো চলছে।

সমাজ রাষ্ট্র, পরিবারে, এবং পেশাদারিত্বে এখন আর নৈতিকতা নেই । লোভ লালসা হিংসা মানুষ কে অন্ধ করে দিয়েছে। টাকা এবং প্রাচুর্যতার লোভে মানুষ এখন

ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি ভুলে গিয়েছে। দূর্নীতির মাধ্যমে দ্রুত ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতা সমাজ কে কলুষিত করেছে ।
বর্তমান সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব বা নৈতিক সত্তার চেয়ে পাশবিক সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তবে, এই অবক্ষয় রুখতে পারিবারিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা জরুরি।

এসকল সামাজিক অনৈতিকতা এবং অনিয়মের পিছনে মূল কারন মানুষের ভিতর আল্লাহভীতি না থাকা।এই প্রসঙ্গে কোরআন হাদিসের কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো -
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: -

**“** হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন**”**... (সূরা আন-নিসা, ৪:১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**“** আমি তোমাদের পরে দুনিয়ায় (ফিতনা হিসেবে) পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কিছু রেখে যাইনি।**”** (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৫০৯৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৭৪০)

## ১.২ চুরি, ডাকাতি, ছিন্তাইঃ

চুরি:একটি মারাত্মক অপরাধ, যা মানুষের সম্পদ ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে। চুরির শাস্তি কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
“চোর, পুরুষ হোক বা নারী, তাদের হাত কেটে দাও; এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”(সূরা আল-মায়েদা: ৩৮)

এই শাস্তি তখনই কার্যকর হবে যখন নির্ধারিত শর্তগুলো পূরণ হয়, যেমন:চুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার (নিসাব) বেশি হতে হবে।অপরাধটি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হতে হবে।

ডাকাতি: যা সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এটি আরও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم

ঁ"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো—তাদের হত্যা করা, ক্রুশবিদ্ধ করা, বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা, অথবা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা।(সূরা আল-মায়েদা: ৩৩)

শাস্তির ধরন:ডাকাতির শাস্তি অপরাধের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল:

১.সম্পদ চুরি এবং মানুষ হত্যা করলে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

২.সম্পদ চুরি করলেও হত্যা না করলে, তার হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে।

৩.শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করলে, তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

ছিনতাই: গুরুতর অপরাধ, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি অস্ত্র দিয়ে মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে, সে আমার অনুসারী নয়।" (সহিহ মুসলিম: ২৬১৩)

এ ধরনের অপরাধ সমাজের শান্তি নষ্ট করে, যা ইসলামে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

**শাস্তি**ঃহযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "একজন চোরকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আনা হলো। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন।" (সহিহ বুখারি: ৬৭৮৮)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।" (সহিহ বুখারি: ৬৭৮৭)

এই বক্তব্য ইসলামে ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

দুনিয়ায় শাস্তিঃআত্মিক শুদ্ধতা ধ্বংস করে।ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতা ও আল্লাহর গজব ডেকে আনে।সমাজে ভীতি, অনাস্থা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আখিরাতে শাস্তি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে, এ ধরনের অপরাধ আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য :

১. অপরাধ দমন: কঠোর শাস্তি অপরাধীদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে।

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: ইসলামে শাস্তির মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য ও স্থিতি বজায় থাকে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা: নিরপরাধ মানুষকে সুরক্ষিত রাখ

চুরি, ডাকাতি, এবং ছিনতাই ব্যক্তি ও সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ইসলামের কঠোর শাস্তি কেবল অপরাধ দমনই নয়, বরং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। আমাদের উচিত আল্লাহর বিধান মেনে চলা, অন্যের অধিকার রক্ষা করা এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।

## ১.৩ যুবসমাজের অবক্ষায়ঃ

একটা সমাজের অন্যতম এবং মৌলিক শক্তি হচ্ছে যুবসমাজ। কিন্তু বর্তমানে এই যুবসমাজই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি এবং ধ্বংসের দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এই ধ্বংসের পেছনে তারা একা দায়ী নয়। দায়ী পরিবার, সমাজ,রাষ্ট্র এবং আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি।

যুব সমাজের অবক্ষয়ের পেছনে কিছু কারণ সম্পর্কে আলোচনা :

**পরিবার :**প্রত্যেকটা মানুষের জন্য প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তার পরিবার। কিন্তু বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেকটাই ভঙ্গুর বলা চলে। এখানে ইসলামি দ্বিনের সঠিক চর্চা নেই, সন্তানদের দেওয়ার মতো পিতা মাতার কাছে সময় নেই। প্রত্যেকেই জীবিকার তাগিদে যার যার মতো করে ব্যস্ত। ফলে সন্তানরা এই যান্ত্রিক শহরে হয়ে পড়েছে অনেকটাই একা । একদিকে যেমন তারা পায়না পারিবারিক স্নেহময় আনন্দঘন পরিবেশ অন্যদিকে তাদের জন্য নেই কোন সামাজিক বড় উন্মুক্ত খেলার মাঠ, সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা। বিপরীতে পিতা মাতারা সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং টেলিভিশন। যার ফলে অনেক যুব সমাজই সঠিক দ্বিনশিক্ষা না পেয়ে, পারিবারিক আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং সুস্থ বিনোদনমূলক পরিবেশের অভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সংস্পর্শে এসে নানা রকম অন্যায়, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা

এবং খারাপ নেশার সাথে জড়িয়ে গেছে । এবং ঝরে পড়েছে অনেক যুবসমাজ।পিতা-মাতা এবং সন্তানেরা উভয় জানেনা তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি এবং তাদের গন্তব্য কোথায়।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা পিতামাতা এবং সন্তানদের ব্যাপারে বলেন-ব্রুয়ারি
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

**"**হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব, কঠিনহৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। (-সূরা তাহরীম ৬৬ : ৬)

উত্তম তরবিয়ত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক।যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তরবিয়ত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তরবিয়তের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তরবিয়ত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান পিতা-মাতার উপর ফরয। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন , মা-বাবা যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় আর সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোনাহে লিপ্ত থাকে তাহলেও মা-বাবা -যদি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন- তাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে এর কিছু দায়ভার তাদের উপরও বর্তাবে।

## ❁ সমাজ এবং রাষ্ট্রিয় দায়বদ্ধতাঃ

যুবসমাজের অবক্ষয় একটি জাতির জন্য অশনিসংকেত। তরুণ প্রজন্ম, যারা একটি দেশের মেরুদণ্ড, তাদের নৈতিক ও সামাজিক স্খলন বা অবক্ষয়ের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র—উভয়ই সমানভাবে দায়বদ্ধ। বর্তমান সমাজে চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, মাদকের বিস্তার ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তরুণদের জড়িয়ে পড়ার পেছনে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণগুলো কাজ করছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা:

- মূল্যবোধের অভাব: পরিবার ও সামাজিকভাবে সৎ, সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষার অভাব যুবসমাজকে বিপথগামী করছে।
- পারিবারিক নজরদারির অভাব: অভিভাবকদের ব্যস্ততা বা উদাসীনতার কারণে সন্তানরা একাকীত্বে ভোগে এবং ভুল পথে পরিচালিত হয়।
- অপসংস্কৃতির প্রভাব: ইন্টারনেট ও বিশ্বায়নের ফলে আকাশ সংস্কৃতির অপব্যবহার তরুণদের নৈতিকতা নষ্ট করছে, যার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- সমবয়সীদের নেতিবাচক প্রভাব: খারাপ সঙ্গ বা বন্ধু মহলে আড্ডা থেকে তরুণরা অনেক সময় মাদক ও অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে

**২. রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা:**

- শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার অভাব: শিক্ষাব্যবস্থা কর্মমুখী না হওয়া এবং নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা কমে যাওয়া অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।
- বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব: বিপুলসংখ্যক তরুণ-যুবক শিক্ষিত হয়েও কর্মসংস্থান না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং অনৈতিক পথে পা বাড়ায়।
- আইনের প্রয়োগে শিথিলতা: অপরাধীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবের কারণে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অপব্যবহার: অনেক ক্ষেত্রে তরুণদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, যা তাদের সহিংসতা ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত করে।

**প্রতিকার ও দায়িত্ব:**

- পারিবারিক সচেতনতা: সন্তানদের সময় দেওয়া, নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের কার্যকলাপের ওপর নজরদারি রাখা।

- মানসম্মত শিক্ষা: শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার।
- আইনের কঠোর প্রয়োগ: মাদক, ধর্ষণ ও অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা।

যুবসমাজকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে একযোগে কাজ করতে হবে, যাতে তরুণরা দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠে, বোঝায় পরিণত না হয়।

## ১.৪পরকীয়া এবং মাদকাসক্ত সমাজঃ

পরকীয়া ও মাদকাসক্তি—এই দুইটি সামাজিক ব্যাধি। আজকের সমাজকে নীরবে কিন্তু গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক অস্থিরতা এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পতনের ফলে এসব সমস্যার বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরকীয়া সম্পর্ক যেমন একটি পরিবারের ভিত নড়বড়ে করে দেয়, তেমনি মাদকাসক্তি একজন মানুষের চিন্তাশক্তি, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এর প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের পথেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই দুটি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজ সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

### মাদকাসক্তিঃ

বর্তমান আধুনিক সমাজ প্রযুক্তির উচ্চ শিখরে পৌঁছার সাথে সাথে সমাজে বেড়েছে পারিবারিক কলহ, বিষন্নতা, হতাশা, বেকারত্ব , বেহায়াপনা ও নগ্নতা। যার ফলে বর্তমান সমাজে বিশেষ করে যুব সমাজের মাঝে মাদকের ব্যাপকতাএবং ভয়াবহতা চরম পর্যায় পৌঁছে গেছে। এটা এখন মহামারীর আকার ধারন করেছে। ঘরে ঘরে এর কারণে অশান্তি বিরাজ করছে। মাদকের আশক্তিতে পড়ে সন্তান পিতামাতাকে চিনছে না। পিতা সন্তান কে চিনছে না। মাদকের চাহিদা পুরন করার জন্য মাদকসেবী প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে ঘরে অশান্তির রাজ্য কায়েম করে। এমনকি এই মাদকের কারণে পিতা সন্তানকে হত্যা করছে। সন্তান পিতাকে হত্যা করছে। আবার কখন স্ত্রী - সন্তান সবাইকে

হত্যা করে নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে ।এমন অহরহ ঘটনা আছে যে বাবা মা টাকা না দিতে পারায় সন্তান দুজনকেই নিজ হাতে হত্যা করে বসে। বর্তমানে এই আঙিনায় নারীদের সংখ্যাও কম নয়। পারিবারিক শিক্ষা, খারাপ সঙ্গ এবং পারিপার্শ্বিক নানান কারণে নারীরাও মাদকাসক্তিতে লিপ্ত হচ্ছে।যার ফলে বাড়ছে পারিবারিক কলহ, সমাজিক বিশৃঙ্খলা, খুন রাহাজানি ইত্যাদি

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও (ভাগ্য) নির্ণায়ক) শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো এ-ই চায় যে, মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং তোমরা কি নিবৃত্ত হচ্ছ?-(সূরা মাইদা ৫: ৯০-৯১)

এ আয়াতে মাদক সম্পর্কে চূড়ান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে এবং একে ঘৃণ্য ও বর্জনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় একে উল্লেখ করা হয়েছে পূজার বেদীর সাথে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, যখন শরাব হারাম করা হল তখন আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ একে অপরের কাছে গিয়ে বললেন, ‘শরাব হারাম হয়েছে এবং একে শিরকের মতো (মারাত্মক গুনাহ) সাব্যস্ত করা হয়েছে।’

**সমাধানঃ**

কোরআন কারিমে মাদক নিষিদ্ধের বিষয়টি তিনটি ধাপে এসেছে।

❁ প্রথমে বলা হয়েছে, “লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এতদোভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য অপকারও, কিন্তু এগুলোতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি” (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২১৯)।

❁ দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হলো-, " হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, এগুলো শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো" (সুরা-৫ মায়েদা, আয়াত: ৯০)।

❁ সর্বশেষে ঘোষণা করা হলো, "'শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাজে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" (সুরা-৫ মায়েদা, আয়াত: ৯১)।

সাহাবিহজরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হলো ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞানতার বিস্তার ঘটবে, মদ্যপান ও মাদকের প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে" (বুখারি, প্রথম খণ্ড, হাদিস: ৮০

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে মিরাজের রাতে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দেখানো হয়েছে। "তিনি মদ, মাদক ও নেশা গ্রহণকারীদের শাস্তি দেখলেন। তারা জাহান্নামিদের শরীর থেকে নির্গত বিষাক্ত নোংরা পুঁজ পান করছে" (বুখারি ও মুসলিম, মিরাজ অধ্যায়)।

❁ **পরকীয়া(জিনা ব্যভিচার)ঃ** বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের ফলে পপরকীয়া /জিনা /ব্যাভিচার একটা মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে রুপ নিয়েছে । এটি কেবল ব্যক্তি জীবনের পবিত্রতা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করে না, বরং পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক স্থিতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের ওপরও গভীর আঘাত হানে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার যে ভিত্তির ওপর একটি সুস্থ পরিবার গড়ে ওঠে, পরকীয়া সেই ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় পারিবারিক অশান্তি, মানসিক কষ্ট এবং সামাজিক অবক্ষয়। তাই পরকীয়া ও ব্যভিচারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নৈতিক মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী।

❁ ❁ **পরকীয়ায় জড়িত হওয়ার কারণঃ**

বর্তমান সমাজে পরকীয়া একটি ব্যাপক সামাজিক ক্যান্সারের মতো আকার ধারন করেছে। এমনকি এই ক্যান্সার যুবক- যুবতী, বৃদ্ধ - বৃদ্ধা, বিবাহিত -অবিবাহিত, কিশোর - কিশোরী, এবং শিক্ষিত- অশিক্ষিত কাউকেই ছাড়েনি।সমাজের প্রত্যেকটি রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এগুলোর পিছনেও রয়েছে প্রভাব বিস্তারকারী কিছু কারণ।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে সেইসব কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে কিছু আলোচনা -

**১. ইসলামী শিক্ষার অভাব:** ইসলাম প্রত্যেকটি মুসলিম নর নারীর উপর ইলম অর্জন করাকে ফরজ করে দিয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক হারাম ও এর ভয়াবহ শাস্তি না জানার কারণে মানুষ পরকীয়ার মত নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে।

**২. সামাজিক কারণ :** ইসলাম সামর্থ্যবান পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিলেও *(নিসা ৪/৩)* অনেক পুরুষ সামাজিক কারণে একাধিক বিয়ে করতে পারেন না। কারণ সমাজ বহু বিবাহকে ভাল চোখে দেখে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন চাহিদার অতৃপ্তি থেকে অনেকে এ সম্পর্কে জড়ায়। অপরদিকে দুর্বল ও অসুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রেও নারী সামাজিক ভয়ে তালাক না নিয়ে পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

**৩. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা :** পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর আলাপচারিতা ও পরবর্তীতে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। মহিলারা আজকাল চাকুরী, ব্যবসা, লেখাপড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য কারণে ইসলামী বিধান উপেক্ষা করে বাড়ির বাইরে যাচ্ছে।এরপর পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও ঠাট্টা-মশকরার মধ্য দিয়ে একে অপরের প্রতি ঝুকে পড়ছে। অথচ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ،ُأَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْت ‘মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ছাহাবী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! স্বামীর ভাইয়ের (দেবর-ভাসুর) ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, স্বামীর ভাই হচ্ছে মরণের ন্যায়’।[4] স্বামীর ভাইয়ের ব্যাপারে যদি ইসলাম এত কঠোরতা আরোপ করে তাহ’লে অপরিচিত বা সাময়িক পরিচিতদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি হ’তে পারে? নিঃসন্দেহে তা আরো কঠোর হবে।

**৪. পর্দাহীনতা :** পরকীয়ার অন্যতম কারণ হ’ল পর্দাহীনতা। এর ফলে নারী-পুরুষ একে অপরের দেখা-সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার সুযোগ পায়। এতে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর শয়তান এটাকে আরো সুশোভিত করে উপস্থান করে এবং পরকীয়ার দিকে নিয়ে যায়। এজন্য ইসলাম পর্দাহীনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَان ‘মহিলারা হচ্ছে আবৃত বস্তু। সে বাইরে বের হ’লে শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে’।[5]

সুতরাং যে পোষাকে নারীর চুল, গ্রীবা, বক্ষ, পেট, পিঠ ও আবৃত অঙ্গ প্রকাশিত থাকে তা পরিধান করা হারাম।

পর্দাহীনতা বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। আর এসবের কারণে নারী-পুরুষ পরকীয়ার দিকে ধাবিত হয়। নিম্নে পর্দাহীনতার কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করা হ'ল।-

**ক. দৃষ্টিপাত :** পরকীয়া শুরু হয় নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। গায়র মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারীর প্রতি তাকানো ইসলাম হারাম করেছে। মহিলাদের মধ্যে যাদের প্রতি সাধারণভাবে তাকানো হারাম তাদের ছবি দেখাও হারাম; এমনকি মৃত হ'লেও। আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً، 'প্রতিটি চোখই যিনাকারী। কোন নারী সুগন্ধি মেখে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন'। অর্থাৎ যিনাকারিণী।[6] তিনি আরো বলেন, اَلعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا اَلنَّظْر، '(মানুষের) চক্ষু দু'টিও যেনা করে, আর চক্ষুদ্বয়ের যেনা হ'ল দৃষ্টিপাত করা'।[7] এই পাপের মাধ্যমেই পরকীয়ার সূচনা হয়।

**খ. কথা বলা :** গায়র মাহরাম নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে সরাসরি বা টেলিফোনে কথা বলার মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক পর্যায়ে তারা পরকীয়ার দিকে ধাবিত হয়, জড়িয়ে পড়ে ব্যভিচারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنا، مُدْرِكٌ ذلكَ لا مَحالَةَ، فالْعَيْنانِ زِناهُما النَّظَرُ، والأُذُنانِ زِناهُما الاسْتِماعُ، واللِّسانُ زِناهُ الكَلامُ، والْيَدُ زِناها البَطْشُ، والرِّجْلُ زِناها الخُطا، والْقَلْبُ يَهْوى وَيَتَمَنّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُه،ُ

'আদম সন্তানের উপর যেনার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে সে অবশ্যই তাতে লিপ্ত হবে। দুই চোখের যেনা হ'ল, দৃষ্টিপাত করা, দুই কানের যেনা হ'ল শ্রবণ করা, মুখের যেনা হ'ল, (গায়র মাহরাম মহিলার সাথে) কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল, স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হ'ল, অগ্রসর হওয়া। আর অন্তর আশা ও আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়ন করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে'।[8] সুতরাং গায়র মাহরাম পুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**গ. স্পর্শ করা :** গায়র মাহরাম নারীর প্রতি তাকানো যেমন যেমন জায়েয নয়, তেমনি তার গায়ে হাত লাগানোও জায়েয নয়। নবী করীম (ছাঃ) পুরুষদের হাতে

হাত রেখে বায়‘আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বায়‘আত নেবার সময় কখনো তাদের স্পর্শ করতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه بايَعَهُنَّ بالكَلامِ، واللهِ ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النِّساءِ إلّا بما أمَرَهُ اللهِ، يقولُ لهنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قدْ بايَعْتُكُنَّ كَلامًا-

‘আল্লাহর কসম! কথার দ্বারা বায়‘আত গ্রহণ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহর কসম! তিনি কেবল সেসব বিষয়েই বায়‘আত গ্রহণ করতেন, যেসব বিষয়ে বায়‘আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বায়‘আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন, আমি কথা দ্বারা তোমাদের বায়‘আত গ্রহণ করলাম’।[9] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমায়মা বিনতে রুকায়া (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়‘আত করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি স্ত্রীলোকের হাতে হাত মিলাই না’।[10] সুতরাং গায়র মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে যেসব পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ, তাদের সাথে মুছাফাহা করা বৈধ নয়। মহিলা বৃদ্ধা অথবা পুরুষ বৃদ্ধ হ’লেও আপোষে মুছাফাহা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভাল’।[11]
মুছাফাহার ব্যাপারে যদি ইসলাম এত কঠোরতা অবলম্বন করে, তাহ’লে কিভাবে একজন বেগানা পুরুষ-নারী একে অপরকে স্পর্শ করতে পারে?

**ঘ. গায়র মাহরামের সাথে সফর করা :** মেয়েদের মাহরাম ছাড়া একাকী অথবা গায়র মাহরামের সাথে সফর করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। কেননা এতে পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। অপরদিকে পরকীয়ার কারণেও নারী-পুরুষ নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য অনেক স্থানে সফর করে থাকে। সেকারণ ইসলাম মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের সফর কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এমনকি হজ্জের মত ফযীলতপূর্ণ সফরও মাহরাম ব্যতীত জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، ‘মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না’।[12] তিনি আরো বলেন, ‘আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে

এমন কোন মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া তিন দিন বা তার বেশী পথ সফর করে’।[13]

**ঙ. মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষের নির্জনবাস করা :** পর্দাহীনতার আরেকটি স্তর হ’ল গায়র মাহরাম নারী-পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়া। ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে। জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ. قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّيْ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ، ‘যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, সে সকল মহিলাদের নিকট তোমরা যেও না। কেননা তোমাদের সকলের মাঝেই শয়তান (প্রবাহিত) রক্তের শিরায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আমাকে আল্লাহ তা‘আলা সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ’।[14]

তিনি আরো বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মাহরাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয় জন থাকে শয়তান’।[15] তিনি আরো বলেন, ‘কোন পুরুষ যেন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মাহরাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না কোন মাহরাম তার সাথে থাকে’।[16]

**৬. ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া :** পরকীয়ার আকেরটি কারণ হ’ল, ছেলে-মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের অমতে বিয়ে দেওয়া। অভিভাবকরা নিজেদের কথা ভাবেন এবং অনেক তাড়াহুড়া করে তাদের সন্তানদের বিয়ে দেন। কিন্তু ছেলে-মেয়ের পসন্দ বা মতামতকে অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন না। ফলে এসব ছেলে-মেয়েদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। ছেলে-মেয়ে প্রথমে মেনে নিলেও পরে তাদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবারের ভয়ে কিছু না বললেও এক সময়য়ে তারা উভয়ে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

**৭. দৈহিক অক্ষমতা :** নারী-পুরুষ জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই চাহিদা পূরণ না হ’লে নারী-পুরুষ পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চাইল্ড অ্যাডোলসেন্ট ও ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলালুদ্দীন আহমাদ বলেন, মনোদৈহিক ও সামাজিক কারণে মানুষ পরকীয়ায় জড়ায়। প্রথমে আসে দৈহিক বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কে অতৃপ্তি থেকে অনেকে এ সম্পর্কে জড়ায়।[18]

**৮. নারীর পোষাক** : পোষাক মানুষকে যেমন সম্মানিত করে তেমনি পোষাকের কারণে অনেক অঘটনও ঘটে থাকে। নারীদের টাইটফিট, আঁট-সাট, পাতলা ও জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকের কারণে পর পুরুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ইসলাম এমন পোষাককে হারাম করেছে, যা পাতলা হওয়ার কারণে ভিতরের চামড়ার রঙ নযরে আসে। এজন্য মুসলিম মহিলাদের পাতলা শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি পোষাক পরিধান করে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়।[19] আলকামাহ ইবনু আবু আলকামাহ (রাঃ) তাঁর মাতা হ'তে বর্ণনা করেন, دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، 'একদিন হাফছাহ্ বিনতু আব্দুর রহমান (রাঃ) একটি খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন'।[20] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيحَهَاوَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী, যাদেরকে আমি দেখিনি (তারা ভবিষ্যতে আসবে।) প্রথম শ্রেণী (অত্যাচারীর দল) যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক, যা দ্বারা তারা লোককে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল সেই নারী যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে, যারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (খোপা বাঁধার কারণে) উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে'।[21]

আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, একদা আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয় তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়। এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দু'হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন'।[22]

**৯. পশ্চিমা সংস্কৃতি** : পশ্চিমাদের নিকট খোলামেলা পোষাকে চলা, বেপর্দায় নিজেকে প্রদর্শন করা অন্যায় নয়। অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়ে পশ্চিমাদের অনুকরণে পোষাক পরিধান, তাদের স্টাইলে চলা এবং তাদের মত বেশ ধারণ করে আধুনিক হওয়ার

চেষ্টা করে। এভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ছেলে-মেয়েরা খোলামেলা পোষাক পরা এবং নারী-পুরুষ অবাধে মেলা-মেশা করার কারণে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে।

**১০. অসমতা** : বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বয়স, আর্থিক সচ্ছলতা, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়সের অধিক ব্যবধানের ফলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। যা এক সময় স্থায়ী বিচ্ছেদের রূপ পরিগ্রহ করে কিংবা তারা পরকীয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এজন্য ইসলাম বয়স, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ، ‘তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ কর এবং সমতা বিবচেনায় বিবাহ কর, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখ’।[23]

**১১. প্রযুক্তির সহজলভ্যতা** : প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবনকে সহজ ও গতিময় করেছে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে এর অপকারিতা জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। হাতের নাগালে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক বিভিন্ন মাধ্যমে থাকার কারণে প্রতিনিয়ত অনেকের সাথে পরিচয় হচ্ছে এ পরিচয় থেকে অনেকে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছে।

**১২. কর্মসংস্থান** : কর্মসংস্থান পৃথক হওয়ার কারণে অনেক স্বামী-স্ত্রী একসাথে অবস্থান করতে পারে না। ফলে পুরুষ তার অফিসের মহিলা সহকর্মীর সাথে এবং নারী তার অফিসের পুরুষ সহকর্মীর সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ‘ক্রিয়ারমেন্টাল হেলথ ইউনিট’-এর

**১৩. বিদেশী টিভি চ্যানেলের প্রভাব** : বিদেশী টিভি চ্যালেনগুলো পরকীয়ার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এসব চ্যানেলগুলো বিভিন্ন সিরিয়ালের আড়ালে মানুষদেরকে পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব বিশেষ করে পরকীয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

**১৪. আইনের দুর্বলতা:** আধুনিক সমাজে পরকীয়ার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বজায় থাকলেও এটি আইনত অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না, তবে অভিযোগ প্রমাণিত হ’লে পরকীয়াকারী ব্যক্তির বিবাহিত সঙ্গী তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে আবেদন করতে পারেন।[25] বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কারো স্ত্রী যদি পরকীয়ায় লিপ্ত হয় তাহ’লে স্বামীর কোন আইনগত প্রতিকার নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে পারে। পরকীয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে স্ত্রীর কোন শাস্তির বিধান নেই। কিন্তু দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা অনুসারে স্ত্রীর প্রেমিকের শাস্তির বিধান

করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাকে আইনের মুখোমুখি করানো যাবে। কিন্তু স্ত্রীকে আইনে সোপর্দ করা যাবে না। এমনকি স্ত্রীকে অপরাধের সাহায্যকারী হিসাবেও গণ্য করা যাবে না।

**ইসলামে পরকীয়ার শাস্তি :**ইসলামে যেসব অপরাধের দন্ড উল্লেখিত হয়েছে, তন্মধ্যে পরকীয়ার মাধ্যমে সংঘটিত যেনা-ব্যভিচারের শাস্তিই সবচেয়ে কঠিন। নিম্নে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হ'ল।-

**যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া:** ইসলামে ব্যভিচারের সকল উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ ব্যভিচার করলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে যেনা-ব্যভিচার প্রমাণিত হলে এর দু'ধরণের শাস্তি রয়েছে।-

**এক. অবিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি :** পরকীয়ার দুই জনের একজন যদি অবিবাহিত হয় তাহ'লে তার শাস্তি হ'ল- ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين- 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*।

**দুই. বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি :**বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু নিশ্চিত করা। আবূ হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, একবার দু'লোক ঝগড়া করতে করতে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এলো। তাদের একজন বলল, আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিন। দু'জনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়ছালা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির কাছে চাকর হিসাবে ছিল। আমার পুত্র তার স্ত্রীর সঙ্গে যেনা করেছে। লোকেরা বলেছে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। তাই আমি একশ' বকরি ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া দিয়েছি।

এরপর আমি আলেমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন হবে। আর রজম হবে ঐ

ব্যক্তির স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়ছালা করে দেব। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনায়ক আসলামীকে আদেশ দেয়া হ'ল অন্য লোকটির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল। সুতরাং তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হ'ল।[26]

বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মায়েয ইবনু মালিক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'আমাকে পবিত্র করুন'। তিনি বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাও ও তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী করীম (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে যখন তিনি চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমি কিসের থেকে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে কি পাগল? জানানো হ'ল, না সে পাগল নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে কি সে মদ্যপায়ী? তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকলেন, কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। তখন তিনি বললেন, أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ 'তুমি কি যিনা করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হ'ল।

উল্লেখ্য যে, যেনা-ব্যভিচারের এই শাস্তি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশের সরকারের। কোন ব্যক্তি বা সামাজিক দায়িত্বশীল তা বাস্তবায়ন করবে না। *[ক্রমশঃ]*

# ❁ ২. পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ❁

## ২.১ স্বামী স্ত্রীর দুজন দুই পৃথিবীঃ

বর্তমান আধুনিক যুগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—স্বামী ও স্ত্রী একই ছাদের নিচে থাকলেও মানসিকভাবে যেন দুই ভিন্ন জগতে বাস করছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, দুনিয়াবী ব্যস্ততা, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ধর্মীয় চেতনার ঘাটতি এর অন্যতম কারণ

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন:
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।” (তিরমিজি)

এই হাদিস আমাদের শেখায় যে, স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ঈমানের অংশ। একইভাবে স্ত্রীর জন্যও স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও সম্মান গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি হাদিসে এসেছে:
“ যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে এবং স্ত্রীও স্বামীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন।” (বায়হাকী)

এ থেকে বোঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকলে আল্লাহর রহমত তাদের উপর নাজিল হয়।
অতএব, আধুনিক যুগে স্বামী-স্ত্রী যদি “দুই পৃথিবী” হয়ে না থেকে একে অপরের সঙ্গী হতে চায়, তাহলে তাদের উচিত—

- একে অপরকে সময় দেওয়া
- সম্মান ও সহানুভূতি বজায় রাখা
- দ্বীনের শিক্ষা অনুসরণ করা
- ছোটখাটো ভুলত্রুটি ক্ষমা করা

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু দুনিয়ার নয়, আখিরাতের সফলতার সাথেও জড়িত। তাই এই সম্পর্ককে মজবুত করতে হলে হাদিসের আলোকে জীবন পরিচালনা করাই সর্বোত্তম পথ।

## ❀ ❀অধিক সন্তান বোঝা নয়ঃ

সন্তান-সন্ততি মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তারা শুধু পার্থিব জীবনের শোভা নয়, বরং আখিরাতের জন্যও কল্যাণের বাহক। ইসলাম ধর্মে সন্তান জন্মদানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং অধিক সন্তান গ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে। কারণ, একটি জাতির ভবিষ্যৎ তার জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ শক্তিশালী হয়, যা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় করে।

বর্তমান সময়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং ভোগবাদী মনোভাবের কারণে অনেক মুসলিম পরিবার সন্তান সীমিতকরণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কেউ আর্থিক সংকটের অজুহাতে, কেউ জীবনযাত্রার মানের অজুহাতে, আবার কেউ পারিবারিক পরিকল্পনার নামে সন্তানসংখ্যা কমাতে চায়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে অধিক সন্তান গ্রহণ শুধু বৈধই নয়, বরং তা মুসলমানদের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন তিনি উম্মতের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করবেন।

বেশি সন্তান গ্রহণের ফজিলত শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী মুসলিম জনসংখ্যা থাকলে তারা ইসলাম প্রচার, প্রতিরক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া, বার্ধক্যে বাবা-মায়ের জন্য অবলম্বন হওয়ার পাশাপাশি নেককার সন্তান দোয়ার মাধ্যমে পিতা-মাতার জন্য আখিরাতে মুক্তির কারণও হতে পারে।

### *১. সন্তান আল্লাহ তায়ালার দান:*

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

**يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا**

‘তিনি যাকে ইচ্ছা কেবল কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা কেবল পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা যাকে ইচ্ছা উভয়ই (পুত্র ও কন্যা) দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন।”(সূরা আশ-শূরা: ৪৯-৫০)

এ আয়াতে বোঝা যায়, সন্তান গ্রহণ আল্লাহর কৃপা ও বিশেষ অনুগ্রহ।

**২. সন্তান থাকা দুনিয়ার সৌন্দর্যের অংশ**

আল্লাহ বলেন: **ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا**

“ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।” (সূরা আল-কাহফ: ৪৬)

অর্থাৎ সন্তান বেশি থাকা দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

**খ) বেশী সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

“তোমরা সেই নারীকে বিয়ে করো, যে অধিক সন্তান জন্ম দেবে এবং স্বামীকে অধিক ভালোবাসবে। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করব।” (আবু দাউদ: ২০৫০, নাসায়ি: ৩২২৭)

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের উৎসাহিত করেছেন অধিক সন্তান জন্ম দিতে, যাতে উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

**সন্তান জান্নাতে প্রবেশের কারন হবে রাসুলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন:**

“যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সন্তানদের প্রতি দয়া করার কারণে।”(বুখারি: ১১৮৩, মুসলিম: ২৬৩২)

এ থেকে বোঝা যায়, বেশি সন্তান থাকলে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

**নেককার সন্তান সদকায়ে জারিয়া-**

**রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:** “মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল চলতে থাকে: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।” (মুসলিম: ১৬৩১)

অর্থাৎ বেশি সন্তান থাকলে তাদের মাধ্যমে দোয়া ও নেক আমলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে অধিক সন্তান গ্রহণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে বেশি সন্তান নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন উম্মতের সংখ্যায় গৌরব করা যায়। একই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক দিক

থেকে এটি কল্যাণকর। সুতরাং, মুসলমানদের উচিত সন্তান জন্মগ্রহণের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা এবং আল্লাহর দেওয়া এই নিয়াম

## ৩.সন্তান প্রতিপালনের নীতিমালাঃ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান আমানত ও নিয়ামত। একটি সন্তান শুধু পরিবারের নয়, বরং সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাই সন্তান প্রতিপালন শুধু ভরণ-পোষণ দেওয়ার নাম নয়; বরং তাকে আদর্শ মানুষ, সুশিক্ষিত, নৈতিক ও দ্বীনদার হিসেবে গড়ে তোলাই প্রকৃত প্রতিপালনের মূলনীতি। বর্তমান যুগে নৈতিক অবক্ষয়, প্রযুক্তির অপব্যবহার ও পারিবারিক দূরত্বের কারণে সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই ঈমান, আখলাক, শিষ্টাচার ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে। কারণ আজকের সুশিক্ষিত ও সৎ সন্তানই আগামী দিনের সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।

১. **সন্তানের প্রতি ন্যায্য আচরণ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায্য আচরণ করো।" (সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৫৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০২৭৫)

২. **ছোটবেলা থেকে ইসলামী শিক্ষা ও আদব শেখানো:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে (না পড়লে) প্রহার করো।" (সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৬৮৯)

৩. **সন্তানের সামনে উত্তম আদর্শ স্থাপন করা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সন্তান জন্মগতভাবে ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা মাজুসী বানায়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৮)

৪. **সন্তানের মাঝে পরস্পর বৈষম্য না করা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার করো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৩)

৫. **সন্তানের জন্য দোয়া করা:** পিতামাতার দোয়া সন্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিনটি দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চিত: মাযলুমের দোয়া,

মুসাফিরের দোয়া এবং পিতার দোয়া তার সন্তানের জন্য।" (সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৬২)

**সারসংক্ষেপ:** সন্তান প্রতিপালনে ন্যায্যতা, ভালোবাসা, ইসলামী শিক্ষা, উত্তম আদর্শ, বৈষম্যমুক্ত আচরণ ও দোয়া অপরিহার্য।

# ❁ ৩.প্রযুক্তির অপব্যাবহার ❁

ভূমিকা :

বর্তমান আধুনিক যুগে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে সহজ, দ্রুত ও উন্নত। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদান অপরিসীম। কিন্তু এই প্রযুক্তি যখন সঠিকভাবে ব্যবহার না হয়ে অপব্যবহারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজকের যুব সমাজ মোবাইল আসক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা, গুজব ছড়ানো, সাইবার অপরাধ ও সময়ের অপচয়ের মতো নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে। তাই প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা এবং এর ক্ষতিকর দিক থেকে সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সকলের

নিচে কুরআন, হাদিস ও বিজ্ঞানের আলোকে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার এবং তা থেকে বের হওয়ার উপায়গুলো আলোচনা করা হলো:

## ❁ ❁৩.১ মোবাইলফোনঃ

**১. কুরআন ও হাদিসের আলোকে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার।**

- সময়ের চরম অপচয়: কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন, "মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে" (সূরা আসর)। মোবাইলে ঘন্টার পর ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং বা গেম খেলে মূল্যবান সময় নষ্ট করা এই আয়াতের আলোকে বড় ক্ষতি।
- অশ্লীলতা ও হারাম দৃশ্যাবলী: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল ভিডিও দেখা হারাম। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না" (সূরা আনআম: ১৫১)।

- ইবাদতে ব্যাঘাত: আজান ও সালাত চলাকালীন মোবাইল ব্যবহার করা, মসজিদে রিংটোন বাজিয়ে মুসুল্লিদের কষ্ট দেওয়া বা ইবাদতের সময় মনোযোগ কেড়ে নেওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন: হাদিস অনুযায়ী, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না (বুখারি)। মোবাইলে আসক্ত হয়ে পাশে বসা পরিবার বা আত্মীয়কে সময় না দেওয়া আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল।
- অনুমতি ছাড়া অন্যের ফোন ঘাঁটাঘাটি: কারো অনুমতি ছাড়া তার মোবাইল ফোন বা ব্যক্তিগত তথ্য দেখা কুরআন-হাদিস বিরোধী, যা প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা ভঙ্গের শামিল।

**২. বিজ্ঞানের আলোকে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ও কুফল**

- শারীরিক স্বাস্থ্যঝুঁকি: অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে চোখের ক্ষতি, ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা (Text Neck), এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। স্মার্টফোন থেকে নির্গত নীল আলো রেটিনার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।
- মানসিক আসক্তি ও বিষন্নতা: সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা (Anxiety) এবং একাকীত্বে ভোগায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি মস্তিষ্কের ডোপামিন ব্যালেন্স নষ্ট করে আসক্তি তৈরি করে।
- কর্মক্ষমতা হ্রাস: ক্রমাগত নোটিফিকেশন চেক করার প্রবণতা মানুষের মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা (Focus) কমিয়ে দেয়।

**৩. মোবাইল ফোনের অপব্যবহার থেকে বের হওয়ার উপায়**

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শের সমন্বয়ে এই আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব:

- নিয়তের সংশোধন (Intention): প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কল্যাণকর কাজ, অপব্যবহার নয়।
- ডিজিটাল ফাস্টিং বা বিরতি: সপ্তাহে বা দিনে নির্দিষ্ট সময়, যেমন- নামাজের সময়, খাওয়ার সময় বা ঘুমানোর ১ ঘণ্টা আগে থেকে মোবাইল থেকে দূরে থাকুন।
- নোটিফিকেশন বন্ধ রাখা: অপ্রয়োজনীয় অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিন, যা মনোযোগ নষ্ট করে।

- মোবাইল-ফ্রি জোন: শোবার ঘর বা খাওয়ার টেবিলকে মোবাইল-ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করুন।
- সময়ের হিসাব রাখা: প্রতিদিন কত সময় মোবাইল ব্যবহার করছেন, তা ট্র্যাক করুন। দিনের শেষে নিজের কাজের হিসাব (মুহাসাবা) করুন।
- পারিবারিক ও সামাজিক সময় বৃদ্ধি: মোবাইলের বদলে সশরীরে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটান, খেলাধুলা বা বই পড়ার অভ্যাস করুন।
- সৎসঙ্গ ও দ্বীনি আলোচনা: মোবাইল ব্যবহারের বদলে কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস অধ্যয়ন বা দ্বীনি মজলিশে সময় কাটান।

মূলনীতি: মোবাইল ফোনকে নিজের গোলাম বানান, নিজে মোবাইলের গোলাম হবেন না। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারই ইসলামের শিক্ষা।

## ৩.২ইন্টারনেটের অপব্যবহারঃ

ভূমিকাঃ

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ নানা রকম প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। যার মধ্যে অন্যতম ইন্টারনেটে ব্যাবস্থা। এই ইন্টারনেট একটা মোহাসাগরের মতো। এই সাগরে যেমন ভালো জিনিস গুলো অসংখ্য অগনিত রয়েছে। তেমনি খারাপ বিষয় গুলোও অসংখ্য অগনিত আছে। এই ইন্টারনেটের অপব্যবহার করে যেমন একজন ব্যাক্তি খুব সহজেই জাহান্নাম কামাই করে নিতে পারে ঠিক তেমনি একে ভালো, জনকল্যাণ এবং দ্বিনের কাগে লাগেও জান্নাত কামাই করে নিতে পারে। তবে এই মহা সমুদ্র এতটাই গভীর যে এখানে চোখ, কান মুখ, হাত কে সংজত রেখে জান্নাত হাসিল করার সুযোগ টা বড়ই কঠিন। কিছু কিছু সময় তো প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে। ইন্টারনেটের এই মহা সমুদ্রে হারিয়ে যায় কত সুখী পরিবার পরিবার,আদর্শ সন্তান চলে যায় বিপথে,। ভাতকে জুটে শুধু হতাশা, নিরাশা, বিষন্নতা, একাকীত্ব, বেকারত্ব।

### কুরআন ও হাদিসের আলোকে মোবাইল ফোনের অপব্যবহারঃ

১.সময়ের চরম অপচয়: কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন, "মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে" (সূরা আসর)।

মোবাইলে ঘন্টার পর ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং বা গেম খেলে মূল্যবান সময় নষ্ট করা এই আয়াতের আলোকে বড় ক্ষতি।

**২.**অশ্লীলতা ও হারাম দৃশ্যাবলী: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল ভিডিও দেখা হারাম। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না" (সূরা আনআম: ১৫১)।

**৩.**ইবাদতে ব্যাঘাত: আজান ও সালাত চলাকালীন মোবাইল ব্যবহার করা, মসজিদে রিংটোন বাজিয়ে মুসুল্লিদের কষ্ট দেওয়া বা ইবাদতের সময় মনোযোগ কেড়ে নেওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ।

**৪.**আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন: হাদিস অনুযায়ী, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না (বুখারি)। মোবাইলে আসক্ত হয়ে পাশে বসা পরিবার বা আত্মীয়কে সময় না দেওয়া আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল।

**৫.**অনুমতি ছাড়া অন্যের ফোন ঘাঁটাঘাটি: কারো অনুমতি ছাড়া তার মোবাইল ফোন বা ব্যক্তিগত তথ্য দেখা কুরআন-হাদিস বিরোধী, যা প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা ভঙ্গের শামিল।

**❇️বিজ্ঞানের আলোকে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ও কুফলঃ**

**১.**শারীরিক স্বাস্থ্যঝুঁকি: অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে চোখের ক্ষতি, ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা (Text Neck), এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। স্মার্টফোন থেকে নির্গত নীল আলো রেটিনার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।

**২.**মানসিক আসক্তি ও বিষন্নতা: সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা (Anxiety) এবং একাকীত্বে ভোগায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি মস্তিষ্কের ডোপামিন ব্যালেন্স নষ্ট করে আসক্তি তৈরি করে।

**৩.**কর্মক্ষমতা হ্রাস: ক্রমাগত নোটিফিকেশন চেক করার প্রবণতা মানুষের মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা (Focus) কমিয়ে দেয়।

**❇️মোবাইল ফোনের অপব্যবহার থেকে বের হওয়ার উপায়ঃ**

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শের সমন্বয়ে এই আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব:

**১.**নিয়তের সংশোধন (Intention): প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কল্যাণকর কাজ, অপব্যবহার নয়।

**২.**ডিজিটাল ফাস্টিং বা বিরতি: সপ্তাহে বা দিনে নির্দিষ্ট সময়, যেমন- নামাজের সময়, খাওয়ার সময় বা ঘুমানোর ১ ঘণ্টা আগে থেকে মোবাইল থেকে দূরে থাকুন।

**৩.**নোটিফিকেশন বন্ধ রাখা: অপ্রয়োজনীয় অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিন, যা মনোযোগ নষ্ট করে।

**৪.**মোবাইল-ফ্রি জোন: শোবার ঘর বা খাওয়ার টেবিলকে মোবাইল-ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করুন।

**৫.**সময়ের হিসাব রাখা: প্রতিদিন কত সময় মোবাইল ব্যবহার করছেন, তা ট্র্যাক করুন। দিনের শেষে নিজের কাজের হিসাব (মুহাসাবা) করুন।

**৬.**পারিবারিক ও সামাজিক সময় বৃদ্ধি: মোবাইলের বদলে সশরীরে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটান, খেলাধুলা বা বই পড়ার অভ্যাস করুন।

**৭.**সৎসঙ্গ ও দ্বীনি আলোচনা: মোবাইল ব্যবহারের বদলে কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস অধ্যয়ন বা দ্বীনি মজলিশে সময় কাটান।

মূলনীতি: মোবাইল ফোনকে নিজের গোলাম বানান, নিজে মোবাইলের গোলাম হবেন না। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারই ইসলামের শিক্ষা।

# ৪.পাশ্চাত্যের কালচার প্রভাব ফেলেছে

**ভূমিকাঃ**

পশ্চাত্যের প্রভাব আমাদের পরিবারগুলোতে বিভিন্নভাবে প্রবেশ করেছে, যেমন পোশাক-আশাকে অশ্লীলতা, ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা, বিয়ে-শাদিতে অপব্যয় ও বিলাসিতা, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, এবং ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়া ইত্যাদি।

**৪.১ নগ্নতাই ফ্যাশনঃ** বর্তমানে নিবোর্ধ কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলিমেরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মডার্ন হতে যেয়ে পশ্চিমাদের পোশাক আশাকেরও অনুকরন করছে। যেসব পোশাক পড়েও শরীরের ভিতর বাহির সবই বুঝা যায়। এই পোশাকের কারনে কতো নারী পথে ঘাটে লাঞ্চিত হয়। শিশুরা বিনা কারনে ধর্ষিত হয়। তবুওনগ্ন পোশাকধারী অমানুষ গুলো বলে পোশাক আমার অধিকার।

**৪.২ যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার:** পাশ্চাত্য প্রভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে একক বা অণু-পরিবারে (Nuclear Family) রূপান্তর ঘটছে, যার ফলে প্রবীণদের নিরাপত্তা ও সন্তানদের লালন-পালনে শূন্যতা তৈরি হচ্ছে।

**৪.৩ পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা:** ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে পারিবারিক সম্পর্কের চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে, যা বন্ধন দুর্বল করছে।

**৪.৪ বয়োজ্যেষ্ঠদের অবহেলা:** পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে প্রবীণদের একাকী বা বৃদ্ধাশ্রমে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ধীরে ধীরে আমাদের প্রথাগত সমাজে প্রভাব ফেলছে।

**৪.৫ বিবাহবিচ্ছেদ ও লিভ-ইন রিলেশনশিপ:** বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়ছে এবং বিয়ের প্রথাগত নিয়মের বাইরে লিভ-ইন রিলেশনশিপের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোতে অস্থিরতা তৈরি করছে।

**৪.৬ ফ্রি মিক্সিংঃ** আমাদের সমাজে ফ্রিমিক্সিং একটি বৈধ ও স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়তে এটি অকাট্য হারাম বিষয়। একটা সময় মুসলিম সমাজে ফ্রি মিক্সিংয়ে অভ্যস্ত এবং এতে লিপ্ত হতে চাওয়া মেয়েকে পাত্রী হিসেবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হত। ফলে পাত্রী পূর্ব থেকে ছেলেদের সাথে

মেলামেশায় অভ্যস্ত থাকলেও ছেলের পরিবারের কাছে বিষয়টি সর্বোচ্চ গোপনীয় রাখার চেষ্টা করত। আর এখন বিবাহ পূর্ববর্তী একটি চাহিদায় পরিণত হচ্ছে এই ফ্রি মিক্সিং। বর্তমানে ফ্রিমিক্সিং চর্চার একটি ভয়াবহ ক্ষেত্র হল টুরিস্ট গ্রুপগুলো। বিগত কয়েকবছরে বাংলাদেশে ট্যুর একটি ফিৎনা এবং মতবাদে রূপ নিচ্ছে। এবং জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এর প্রভাব মাদ্রাসায়ও ঢুকে পড়েছে। এই ট্যুর এমন এক নেশায় পরিণত হচ্ছে যেখানে দ্বীন, নৈতিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোন কেয়ার থাকে না। উন্মাদ এক নেশা কাজ করে এই সমস্ত ট্যুর গ্রুপগুলোতে। দেখা যাচ্ছে, হিজাব, বোরকা, দাড়ি, টুপি পরিধান করেও অনেকে ফ্রিমিক্সিংয়ে লিপ্ত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাধ্য হয়ে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। এটা সত্য। কিন্তু অধিকাংশই হচ্ছে ইচ্ছাকৃত, স্বপ্রণোদিত এবং জাহেলিয়ায় গাঁ ভাসিয়ে দেয়ার তাড়না থেকে।

তিনচারটা ছেলের সাথে একটা মেয়ে ঢাকা থেকে চট্রগ্রামে চলে যাচ্ছে। লঞ্চের কেবিনে করে বরিশাল ট্যুর দিচ্ছে। দূর দূরান্তে গিয়ে হোটেল ভাড়া করে থাকছে। এর মধ্যে অনেক হিজাব ও বোরকা পরিহিত বোনকেও দেখা যায়। প্রথমত মাহরাম ছাড়া সফর করাই মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। সেখানে এই বোনেরা মাহরাম ছাড়া ফ্রি মিক্সিংয়ের পরিবেশ সাথে নিয়ে ঘুরছে ফিরছে। ব্যাপারটা ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই নিষিদ্ধ। দোষটা উভয়ের কাঁধেই যাবে।

**৪.৭ভোগবাদী মানসিকতা:** দায়িত্ববোধের চেয়ে ভোগবিলাস ও বস্তুবাদী অর্জনের দিকে ঝোঁক বাড়ছে।

**৪.৮ সন্তানদের স্বাধীনতা:** ১৮ বছর বয়সের পর বা পড়াশোনা শেষেই সন্তানদের আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

**৪.৯ পিতামাতার ভূমিকার পরিবর্তন:** সন্তানকে শাসন করার চেয়ে বন্ধুসুলভ আচরণ করা বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি শাসনহীনতার কারণও হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ:

পশ্চিমাদের প্রভাব পারিবারিক কাঠামোর আধুনিকায়নে (যেমন- নারীশিক্ষা ও সচেতনতা) সহায়ক হলেও, এটি যৌথ পারিবারিক প্রথা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং প্রবীণদের যত্নের মতো ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধগুলোকে

**সমাধান:**

১. পরিবারে ইসলামী শিক্ষা ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো" (সূরা তাহরীম: ৬)।

২. পোশাক-আশাকে শরীয়তের সীমারেখা মেনে চলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পোশাক পরিধানে বিলাসিতাকে অপছন্দ করেন" (আবু দাউদ, হাদীস: ৪০২৮)।

৩. ছেলে-মেয়েদের মাঝে পর্দা ও শালীনতা রক্ষা করা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অ-মাহরাম নারীর সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলা ও দেখা জায়েয নয় (ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩৫৩)।

৪. বিয়ে-শাদি সহজ ও সুন্নাহসম্মত করা। রাসূল (ﷺ) বলেন: "সর্বোত্তম বিয়ে হলো যাতে কম খরচ হয়" (মুসতাদরাকে হাকিম, ২/১৮৪)।

৫. সন্তানদের ইসলামী আদব ও আখলাক শেখানো এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ থেকে বিরত রাখা।

# ❁ ৫. সমকামিতা ❁

**ভূমিকাঃ**

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে সমকামিতা নামক প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও নিকৃষ্ট কাজটির প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। এর প্রচার-প্রসারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে হাবুডুবু খাওয়া কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে। এরা বিভিন্ন এনজিও এর ছাত্র ছায়ায় যুবকদেরকে এই অন্যায় কর্মে লিপ্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইতোমধ্যে বহু যুবক-যুবতী তাদের খপ্পরে পড়ে শুধু তাদের দ্বীনদারী ও চরিত্রকে ভূলুণ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং পুরো জীবনটাকেই এক গন্তব্যহীন অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সে কারণে আমাদের যুব সমাজকে রক্ষা করতে এ বিষয়ে সচেতনতা খুবই জরুরি।

যাহোক, নিম্নে সমকামিতার ভয়াবহতা, ইসলামি ও প্রচলিত আইনে এর শাস্তি এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হল:

❁ইসলামে সমকামিতাঃ

(homosexuality) তথা পুরুষের সাথে পুরুষ অথবা নারীর সাথে নারীর যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কবিরা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটি জিনার থেকেও নিকৃষ্ট। কেননা তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ যৌনাচার এবং মানবতা বিধ্বংসী আচরণ।

মানবজাতির পরিবার গঠনের স্বাভাবিক নিয়ম হল, একজন পুরুষ একজন নারীকে বৈধভাবে বিয়ে করার পর তারা দাম্পত্য জীবন গঠন করবে। অত:পর স্বামী-স্ত্রী মধুর মিলনে স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান জন্ম দিবে। অতঃপর বাবা-মা সন্তানের পরিপালনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিবেন। এই তো একটি সুন্দর মানবজীবন। এভাবে মানব সন্তানের বংশ বিস্তার ঘটবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এই সুন্দর বসুন্ধরা। কিন্তু সমকামিতা হল, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ এবং মানবজাতির বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

কেন মানুষ সমকামী হয়? বিজ্ঞানীরা সমকামিতার প্রকৃত কারণ জানেন না কিন্তু তারা

তাত্ত্বিকভাবে ধারণা করেন যে, জিনগত, হরমোন গত এবং পরিবেশগত কারণসমূহের এক জটিল আন্তক্রিয়ার ফলে এটি ঘটে থাকে। (উইকিপিডিয়া) তবে কিছু মানুষ স্বাভাবিক যৌন চাহিদা তথা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ থাকার পরও বিকৃত মানসিকতার কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে সমকামিতায় লিপ্ত হয়।

**ইসলাম সমকামিতার পথ বন্ধ করেছে যেভাবে:**

ইসলাম সমকামিতার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনা প্রদান করেছে তা হল,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এক পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না। তেমনি এক নারী অপর নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না। দু জন পুরুষ একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করবে না। তেমনি দুজন নারী একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করবে না।" (মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৬৬ 'বিবাহ' অধ্যায়)।

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهاَ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এক নারী অপর নারীর চামড়ার সাথে চামড়ার লাগাবে না। কারণ সে তার স্বামীকে ঐ নারীর অঙ্গের বিবরণ দিতে পারে তখন তার স্বামী ঐ নারীকে যেন অন্তরের চোখে দেখবে।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯; বাংলা ৮ম খন্ড, হা/৩৯২১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)। এ দুটি হাদিসে ইসলাম সমকামিতার মত ভয়াবহ ও ঘৃণিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

**ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতার ভয়াবহতা:**

নি:সন্দেহে সমকাম ধ্বংসাত্মক ও অভিশপ্ত পাপকর্ম, আল্লাহর শাস্তির কারণ ও মানবতা

বিধ্বংসী অপরাধ।

নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ ও প্রচলিত আইনের আলোকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল:

**১. সমকাম আল্লাহর আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ:**

লুত সম্প্রদায়ের লোকজন সমকামিতায় লিপ্ত হলে মহাশক্তিধর আল্লাহ তাদেকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন তা ফুটে উঠেছে এই আয়াতে:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

"অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, এরপর যখন আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর হল, তখন আমি জনপদের উপরিভাগ নিচে এবং নিম্নভাগ উপরে উঠালাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম।" (সুরা হুদ: ৮২)

ইতিহাসে এই ভয়াবহ ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে জর্ডানে অবস্থিত 'ডেড সি' (The Dead Sea) বা মৃত সাগর।

**২. সমকামিতা একটি অভিশপ্ত কর্ম:**

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا -(حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند)

"যে ব্যক্তি লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত হবে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।যে ব্যক্তি লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত হবে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।" এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। (মুসনাদ আহমদ ২৯১৫/শাইখ শুআইব আরনাবুত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)

৩. তাছাড়া সমকামিতাকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ প্রাণঘাতী এইডস সহ নানা জটিল ও কঠিন রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

❑ **ইসলামি আইনে সমকামিতার শাস্তি:**

ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী সমকামিতার শাস্তি হল, মৃত্যুদণ্ড: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাদেরকে তোমরা লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত দেখবে তাদের উভয়কেই হত্যা করো। (তিরমিজি: ৪/৫৭; আবু দাউদ: ৪/২৬৯; ইবনে মাজা: ২/৮৫৬- 'শাইখ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন)
আল্লামা বিন বায রহঃ বলেন,

أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب الرسول ﷺ وقد أجمعوا جميعًا على قتل اللوطي مطلقًا سواء كان بكرًا أو ثيبًا، بعض الفقهاء قالوا: إنه كالزاني يرجم المحصن ويجلد البكر مائة جلدة ويغرب عامًا، ولكنه قول ضعيف
"সমকামিতার শাস্তি হল, হত্যা। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিদের সম্মিলিত অভিমত রয়েছে। তারা সকলেই একমত যে, সমকামীকে হত্যা করা হবে চাই যে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।
কতিপয় ফকিহ বলেন যে, সমকামিতার ক্ষেত্রে জিনার মতই বিবাহিত হলে, তার শাস্তি পাথর মেরে হত্যা আর অবিবাহিত হলে এক একশ চাবুক ও একবছর দেশান্তর (জেল বা নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়া)। কিন্তু এটি দুর্বল কথা।" [শাইখের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট]
অবশ্য যদি কারও সাথে জোরপূর্বক সমকামিতা করা হয় বা যার সাথে এই অন্যায় করা হয়েছে সে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা পাগল হয় তাহলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

## ❑ প্রচলিত আইনে সমকামিতার শাস্তি:

অধিকাংশ সমাজে এবং সরকার ব্যবস্থায় সমকামী আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ: বাংলাদেশ (দশ বছরের থেকে শুরু করে আমরণ সশ্রম কারাদণ্ড) সহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬ টি দেশের সংবিধানে ৩৭৭ ধারা এবং ১৯টি দেশে

সমপর্যায়ের ধারা এবং সম্পূরক ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতি বিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবেক পায়ু মৈথুন শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ, যার শাস্তি দশ বছর থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে। এ আইনে বলা হয়েছে:
৩৭৭. প্রকৃতিবিরুদ্ধ অপরাধ: কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে। ব্যাখ্যা: ধারা অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণে যৌনসংগমের প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে লিঙ্গ প্রবেশের প্রমাণ যথেষ্ট হবে।
৩৭৭ ধারার ব্যাখ্যায় পায়ু সঙ্গম জনিত যে কোন যৌথ যৌন কার্যকলাপকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একারণে, পরস্পর সম্মতিক্রমে বিপরীতকামী মুখকাম ও পায়ু মৈথুনও উক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। [মুক্ত বিশ্বকোষ, বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার]

## ❑ কেউ যদি জন্মগত ভাবে সম লিঙ্গের দিকে আকর্ষণ অনুভব করে তাহলে তার কী করণীয়?

সৃষ্টিগত ভাবে কারো মধ্যে সমলিঙ্গের দিকে আকর্ষণ থাকলে তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাকে এমনটি করেছেন তার প্রতি পরীক্ষা হিসেবে। যেমন অনেক প্রতিবন্ধী মানবিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কারও চোখ নাই, কারও কথা বলার ক্ষমতা নাই, কেউ বা কানে শুনে না ইত্যাদি। ঠিক তেমনি সেও নারীর প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ বোধ থেকে বঞ্চিত।
যাহোক, কোন ব্যক্তি যদি ব্যক্তি সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে তাহলে এ থেকে বাঁচার জন্য তার জন্য নিম্নে ৮টি করণীয় তুলে ধরা হল:
১) সে আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের শাস্তির কথা চিন্তা করে ধৈর্য ধারণ করবে এবং এ জঘন্য গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কোনভাবেই সম লিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক

স্থাপন করবে না। যদি সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

"তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দেয়া হবে সম্ভাষণ ও সালাম। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম!" (আল ফুরকান: ৭৫ ও ৭৬)

২) সর্বদা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখবে। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিয়ামতের মাঠে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমরা যত অন্যায় ও পাপকর্ম করেছি সব কিছুই প্রকাশিত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত।" (সূরা নূর: ২৪)

৩) যদি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মোটেই আকর্ষণবোধ না থাকার কারণে বিয়ে করা সম্ভব না হয় অথচ প্রচণ্ড যৌন বাসনা অনুভব করে তাহলে করণীয় হল, রোজা রাখা। কেননা রোজার মাধ্যমে যৌন বাসনা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

৪) কখনো একাকী নিভৃতে না থাকা। কেননা একাকীত্ব যৌন চিন্তা জাগ্রত করে। বরং যে কোন দীন বা দুনিয়ার উপকারী কাজে সময়কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে হবে। যেমন: নেক আমল করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনে তাফসির পড়া, কুরআন মুখস্থ করা, জিকির করা, নামায পড়া, ইসলামি বই পড়া, ভালো আলেমদের লেকচার শোনা, শিক্ষণীয় ও উপকারী কোন কোর্স করা, জনকল্যাণ মূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া, শখের কাজ করা (যদি তা হারাম না হয়) ইত্যাদি।

৫) পাপিষ্ঠ ও খারাপ লোকদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। কারণ মানুষ সঙ্গ দোষে অন্যায় ও অশ্লীল পথে পা বাড়ায়।

৬) যৌন উদ্দীপক মুভি, মিউজিক ভিডিও, গান, টিভি শো ইত্যাদি না দেখা এবং অশ্লীল গল্প-উপন্যাস না পড়া।

৭) যৌন বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে এমন খাওয়া-দাওয়াও সীমিত করা দরকার। কেননা এসব খাদ্যের প্রভাবে শরীরে যৌন চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৮) তারপরও মনে খারাপ চিন্তা জাগ্রত হলে তৎক্ষণাৎ শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা তথা আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজীম পাঠ করা কর্তব্য।

৯) সর্বোপরি মহান আল্লাহর নিকট নিজের সমস্যা থেকে মুক্তি চেয়ে দুআ ও আরাধনা করা।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সকল প্রকার পাপাচার ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

# ❁ ৬.নারী অধিকার ❁

**ভূমিকা :**

বর্তমান সমাজে নারী অধিকার নিয়ে নানা স্লোগান, আন্দোলন ও আলোচনা প্রতিনিয়ত শোনা যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অধিকারের নামে অনেক সময় নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। অথচ ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই নারীকে দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান, নিরাপত্তা ও অধিকার। যে যুগে কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সে যুগেই ইসলাম ঘোষণা করেছে— নারী হলো মায়ের মর্যাদায় জান্নাতের চাবিকাঠি, স্ত্রীর মর্যাদায় শান্তির নিবাস এবং কন্যার মর্যাদায় আল্লাহর রহমত। ইসলাম নারীকে শুধু অধিকারই দেয়নি; দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের সর্বোচ্চ আসন। তাই প্রকৃত নারী অধিকার ও সম্মানের কথা বলতে হলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতেই ফিরে আসতে হবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন," هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ";রড্য,

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক" *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا ।-ً

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' *(নিসা ১)*।

### ❁ ❁৬.১ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান।

নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

## ৬.২ ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? *(তাকভীর ৮-৯)*।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার

উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' *(নূর ৩৩)*। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

### ৬.৩ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

**হিন্দু ধর্মে :** নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই।

**বৌদ্ধ ধর্মে :** বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।[3]

**ইহুদী ধর্মে :** এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'।[4] তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

**খৃষ্টান ধর্মে :** খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।[5]

**চীন সভ্যতায় :** চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।[6]

**গ্রীক সভ্যতায় :** বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।[7]

**৬.৪ রোম সভ্যতায় :** রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।[8]

**৬.৫ বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :**

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## ৬.৬ নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকাঃ

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' *(হুজুরাত ১৩)*। মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-ً

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ۞وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة 'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

**(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-ْ

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের

সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' *(নিসা ৩)*।

**(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।[9]

**(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[10]

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' *(নিসা ১৯)*।

**(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :**

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।[11]

**(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم-

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ'তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ'লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

# ৭.মানসিক চাপ

## মানোসিক চাপঃ

বর্তমান আধুনিক যুগে মানুষ নানান ভাবে হতাশা এবং নিরাশায় ভোগে। কেউ পারিবারিক কারণে , কেউ অর্থনৈতিক কারণে , কেউবা সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত আবার কিছু মানুষ সাংসারিক বিভিন্ন  কারণে হতাশাগ্রস্থ। এই হতাশা, নিরাশা এক সময় মানসিক চাপে রূপ নেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে কেউ না কেউ আত্মহত্যার মাধ্যমে প্রাণ হারায়। এসব আত্মহত্যাকারীরা কোনো না কোনোভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, মানসিক সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তি মানুষের কতবেশি জরুরি।

কুরআন হাদিসের আলোকে এসব মানসিক চাপ থেকে মুক্তির কিছু উপায় আলোচনা করা হলো:-

### ১. নিয়মিত জিকির আজকারঃ

জিকির মানুষের অন্তরকে প্রফুল্ল করে তোলে।

সব দুঃশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে মুক্ত থাকে মুমিন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

الَّذِينَآمَنُواوَتَطْمَئِنُّقُلُوبُهُمبِذِكْرِاللّٰهِأَلَابِذِكْرِاللّٰهِتَطْمَئِنُّالْقُلُوبُ

যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণেই (মানুষের) অন্তর প্রশান্ত হয়। ’ (সুরা রাদ : আয়াত ২৮)

### ২. চিকিৎসা গ্রহণঃ

চূড়ান্ত মানসিক অসুস্থতায় প্রথমেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা নেওয়ার বিকল্প নেই। ইসলামে প্রচলিত দিনির্দেশনা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। তবে উন্মাদনাসহ সব ধরনের মানসিক রোগের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ-পথ্য চালিয়ে যাওয়া।

## ৩. নিয়মিত কোরআন পড়াঃ

কোরআন তেলাওয়াতে মানুষের মনের স্থির হয়। মানসিক বিষন্নতা কমে যায়। কোরআন মানুষের জন্য মানসিকসহ অনেক রোগের সুচিকিৎসা এবং রহমত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

نُنَزِّلُمِنَالْقُرْآنِمَاهُوَشِفَاءوَرَحْمَةٌلِّلْمُؤْمِنِينَوَلَايَزِيدُالظَّالِمِينَإِلَّاخَسَارًا

'আমি কোরআনে এমন বিষয় নাজিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। ' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৮২)

## ৪. নামাজে যত্নবান হওয়াঃ

বিষন্নতা ও অস্থিরতায় সুস্থ থাকতে নামাজে মনোযোগী হওয়া জরুরি। নামাজ মানুষের মনকে স্থির করে দেয়। যাবতীয় মানসিক অস্থিরতা দূর করে দেয়। যার প্রমাণ স্বয়ং বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অস্থিরতা দূর করতে নামাজের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّالْإِنسَانَخُلِقَهَلُوعًاإِذَامَسَّهُالشَّرُّجَزُوعًاوَإِذَامَسَّهُالْخَيْرُمَنُوعًاإِلَّاالْمُصَلِّينَالَّذِينَهُمْعَلَىٰصَلَاتِهِمْدَائِمُونَ

'নিশ্চয়ই মানুষ ভীরুরূপে সৃজিত হয়েছে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে (মনে অস্থিরতা তৈরি হয়)। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামাজ আদায়কারী। যারা তাদের নামাজে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। ' (সুরা মাআরিজ : আয়াত ১৮-২৩)

'তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। ' (সুরা বাকারা : আয়াত ৪৫)

হাদিসে এসেছে, وكان ﷺ- إذاحزبهأمرٌفزعإلىالصلاة রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অস্থির হয়ে যেতেন তখন তিনি নামাজে দাড়িয়ে যেতেন। ' (আবু দাউদ)

## ৫. ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ

মানসিক চাপ সামলাতে ইসতেগফার কার্যকরী আমল। যেসব কারণে মানসিক চাপ বাড়ে, তন্মধ্যে অন্যায়-অপরাধে জড়ানো, অর্থকষ্টে থাকা, সন্তান-সন্ততি না থাকা,

জীবিকার অপ্রতুলতা ইত্যাদি হতাশা। এ সবের সমাধানে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা হলো ইসতেগফার করা। কুরআনে এসেছে-

- 'অতপর বলেছি- তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। ' (সুরা নুহ : আয়াত ১০-১২)

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইসতেগফার করবে, আল্লাহ তাআলা তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন। তার সব দুঃশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। ' (আবু দাউদ)

৬. তাকদিরে বিশ্বাস রাখা

সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সব কিছুর ক্ষেত্রেই মুমিন বান্দা তাকদিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আর দুঃখ-হতাশা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ, নিঃসন্তান ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ মানসিক চাপে ভোগে। তাই মানসিক চাপের সময় মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তাকদিরর উপর ছেড়ে দেওয়ায় রয়েছে মানসিক প্রশান্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন-

> 'আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা মোচন করতে পারে না। আর আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ পরিবর্তন করারও কেউ নেই। ' (সুরা ইউনুস : আয়াত ১০৭)

> 'পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি ইহা সংঘটিত করার আগেই ইহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে ইহা খুবই সহজ। ' (সুরা হাদিদ : আয়াত ২২)

## ৭. নেশা ছেড়ে মধু পান করাঃ

নেশা ছেড়ে নিয়মিত মধু পান করা। ইসলামে মধুকে (মানসিক ও শারীরিক)সব রোগের ওষুধ মনে করা হয়। মধুর প্রাকৃতিক ওষুধি গুণাগুণ শরীরের যাবতীয় বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান বের করে দেয় যা মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। মধু পানে নবি ঈসা ও আইয়ুব আলাইহিস সালাম বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনেও মধুকে শেফা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

## ৮. হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়াঃ

অস্বাস্থ্যকর ও হারাম খাবার গ্রহণ না করা। এটি নিশ্চিত যে মানুষের শরীর ও মনে হারাম ও অস্বাস্থ্যকর খাবার বিরূপ প্রক্রিয়া করে। যারা হারাম খেয়ে দিব্যি সুস্থ আছে; কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায়, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেও তারা মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত।

৯. পরিবারের সান্নিধ্যে থাকা

মানসিক যেকোনো রোগ বা অশান্তিতে পরিবার কাছে থাকা খুবই জরুরি। পারিবারিক সান্নিধ্য মানসিক অশান্তি দূর হওয়ার সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান। পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসা ও সেবায় দ্রুত মানসিক রোগ ও বিষন্নতা দূর হয়। এ কারণে সবসময় প্রিয় মানুষগুলোর মধ্যে থাকার চেষ্টা করা, এতে মনের যাবতীয় ক্ষোভ ও হতাশা দূর হয়ে যাবে। জীবনের সুখ শান্তি ষোল আনাই নির্ভর করে মানসিক প্রশান্তির ওপর।

## ৯.ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করাঃ

নিয়মিত ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিতে মানসিক দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও মানসিক কষ্ট দূর করতে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে দৃঢ়ভাবে লালন করতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ যারা নিয়মিতভাবে ধর্মীয় বিষয়াদিতে মনোযোগী হয় তাদের মানসিক সুস্থতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি।

আল্লাহ তাআলা মসুলিম উম্মাহসহ সবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, কর্মক্ষেত্রের সব মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থেকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে মানসিক চাপমুক্ত জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে

শিক্ষা

# ❁ ৮.মুজুদদারী ও বাজার সিন্ডিকেট ❁

**ভূমিকাঃ** প্রায়শই দেখা যায়, দেশে পর্যাপ্ত পণ্যের উৎপাদন সত্ত্বেও দ্রব্যের মূল্য অযৌক্তিক পর্যায়ে থাকে। এর অনেকগুলো কারণের অন্যতম মজুদদারি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে মজুদদারি একটি প্রাচীন এবং পরিচিত ধারণা। এর মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ধরা যাক, এ বছর দেশে প্রচুর আদা উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু সাধারণ কৃষকের উৎপাদিত এই আদা বাজারে সরাসরি আসে না বললেই চলে। পণ্যের বিপণনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। এই ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মজুদদারি করেন। কৃষক থেকে আদা কিনে তারা সেটা বাজারে সরবরাহ না করে গুদামজাত করে রাখেন। ফলে বাজারে গিয়ে ক্রেতারা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে আদা পায় না। আর কোনো পণ্যের সরবরাহ যখন চাহিদার থেকে কম হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই পণ্যটির দাম হুহু করে বাড়তে থাকে। এতেই ফুলে-ফেঁপে ওঠে অসাধু ব্যবসায়ীরা। আর কৃত্রিম সঙ্কটের ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ ক্রেতাদের। পণ্য কিনতে হয় বেশি দাম দিয়ে।

ইসলাম এসব অসাধুতার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অধিক মুনাফার লোভে মজুদদারি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

মা'মার ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পাপাচারী ছাড়া অন্য কেউ মজুদদারি করে না।" [1]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের শরী'আত অননুমোদিত পন্থায় অন্যের সম্পদ ভক্ষণ থেকে বারণ করেছেন। পাশাপাশি বৈধ কেনাবেচায় জুড়ে দিয়েছেন ক্রেতা-বিক্রতা উভয়পক্ষের লাভ ও উপকারিতার ভিত্তিতে স্বতস্ফূর্ত সম্মতির শর্ত। মজুতদারি যেহেতু ব্যবসার অনুমোদিত কোনো পন্থা নয়, তাই এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ অবৈধ পন্থায় উপার্জিত বলে তা আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাদেশে যে দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে তা তৈরিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে মজুদদার, সিন্ডিকেটকারী, ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীরা। গ্রামের যে কৃষকরা রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘর্মাক্ত শরীরে শস্য ফলান, যাদের অবদানে জঠরজ্বালা নিবারিত হয়ে সারা দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটে, তাদের ভাগ্যের কোনো হেরফের হয় না। অসাধু চক্রের ভাগ্যবদল হয় অতিদ্রুত। এরাই মুটে-মজুর-চাষীদের ভাগ্যবদলে সবচে বড় বাধা। অথচ হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওসাল্লাম বলেন, "স্বল্পমূল্যে কেনার জন্য বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছেন।" [2]

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও মজুদদারী অবৈধ। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মজুদদারি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং মজুদদারীর অপরাধে কঠোর সাজার বিধান বলা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২(ঙ) ধারায় মজুদদারীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, মজুদদারী বলতে বোঝায় কোনো আইন দ্বারা বা আইনের আবর্তে কোনো ব্যক্তি মজুদ অথবা গুদামজাত করার সর্বোচ্চ পরিমাণের বেশি দ্রব্য মজুদ বা সংরক্ষণ করা। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(১) ধারায় মজুদদারী বা কালোবাজারি ব্যবসার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেউ মজুদদারী বা কালোবাজারে লেনদেনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সে মৃত্যুদণ্ড [3] বা আজীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বছর পর্যন্ত ব্যপ্ত হতে পারে এমন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

তবে উল্লেখ্য, মজুদদারীর অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রমাণ করে, সে আর্থিক বা অন্যভাবে লাভের জন্য মজুদ করে নি, সে ক্ষেত্রে তাকে সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। আদালত মজুদদারী বা কালোবাজারে লেনদেন করার অপরাধে শাস্তি প্রদান করার সময় যা সম্পর্কে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা সরকার বরাবর বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদান করবে

। আইন থাকলেও এদের টিকিটি স্পর্শ করতে পারে না প্রচলিত আইন বা আইন প্রয়োগকারীর হাত। তবে মানুষের আইনে পার পেয়ে গেলেও আল্লাহর আইনে কোনো রেহাই নেই। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ লঙ্ঘন করায় পরকালে যেমন তাদের শাস্তি অবধারিত, তেমনি ইহকালেও ক্ষণিকের জন্য লাভবান হলেও অচিরেই আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেন। কুরআনের ভাষায় রোগ-শোক, প্রাণ ও সম্পদক্ষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ পার্থিব শাস্তি দেন।

ইসলামী আইনবিদদের মতে মজুদদারি হলো, সঙ্কটকালে বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে এ উদ্দেশে মজুদ করা যে চাহিদা আরও বাড়লে বেশি দামে বিক্রি করা হবে। অতএব, নিম্নোক্ত অবস্থাগুলো মজুদদারির অন্তর্ভুক্ত নয়:

**১.** আদমানীকারকের সংগ্রহ যারা বাজার থেকে পণ্য ক্রয় না করে বিদেশ থেকে আমদানী করেন।

**২.** পণ্য সস্তা থাকতে তা ক্রয় করা যখন বাজারে সরবরাহে কোনো ঘাটতি না থাকে।

**৩.** পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সময় ক্রয় করা যখন লক্ষ্য থাকে মজুদ না গড়ে তখনই বিক্রি করা।

**৪.** রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা ও আপৎকালীন সময়ের জন্য যে খাদ্য মজুদ করেন তাও মজুদদারি নয়।

**৫.** তাছাড়া একজন মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ দাম বাড়লে বিক্রি করবে এ আশায় রেখে দিলে সেটাও মজুদদারি হবে না।

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১৫৪, আলবানী সহীহ বলেছেন।

[2] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১৭৯।

[3] শুধু মজুদদারির কারণেই যদি একটা মৃত্যুদন্ড হয় তাহলে এমন অপরাধ আর কেউ করার সাহস পাবে না।

# ❁ ৯.নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ❁

**ভূমিকাঃ**

নারীর নিরাপদ পথচলায় ধর্মীয় বিধান ও দিক-নির্দেশনা মেনে চলার বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। বিবেক-বুদ্ধিকে সদা জাগ্রত রাখার জন্য কুরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে নারী-পুরুষ সবাইকে তাকওয়ার অধিকারী হতে বলেছেন। কারণ তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন থেকে হেফাজত করে।

ঘরে-বাইরে, পাড়া-মহল্লায় কিংবা চলার পথে বিশ্বব্যাপী নারীরা অহরহ যৌন হয়রানিসহ নানা সমস্যায় পড়ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে নৈতিকতা বিবর্জিত কাজকে নিরুৎসাহিত করেছেন। নারীদের কল্যাণে পুরুষরা যাতে নিজেদেরকে সংযত করে কুরআনে সে নির্দেশ প্রদান করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'হে রাসুল!) ঈমানদার পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্র।' (সুরা নুর : আয়াত ৩০)

আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা কর্মনীতি পেশ করেছেন। জীবন পরিচালনায় এক দিকে যেমন পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি কুদৃষ্টি ও ধ্যান-ধারণার নিষেধ করেছেন। আবার নারীদেরকে পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

নারী-পুরুষ উভয়ের কল্যাণে আলাদা আলাদা আদেশ, নিষেধ, উপদেশ বর্ণনা করেছেন। শুধু পুরুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে যেমন নারীর নিরাপদ পথচলা নিশ্চিত করা যাবে না। তেমনি নিরাপদ পথচলায় নারীর জন্যও রয়েছে করণীয়। ঘরের বাইরে নারীদেরকে শালিন ও সভ্য পোশাকে চলতে হবে। যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতাও পরিহার করতে হবে। তাইতো আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন-

'হে বনি আদম! আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে এবং যা হবে (তোমাদের জন্য) ভূষণ। আর পরহেজগারির পোশাক, এটিই সর্বোত্তম।'

(সূরা আরাফ : আয়াত ২৬)

পুরুষরা বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরে বিভিন্ন কাজে অবস্থান করে। তাদের এ অবস্থানকালীন সময়ে কোনোভাবেই যেন কোনো অন্যায় সংঘটিত না হয়। রাস্তার হক নষ্ট না হয়, আনন্দ-বিনোদনে নারীরা যাতে হেয় কিংবা আক্রমণের শিকার না হয়। সে জন্য কুরআন হাদিসে এসব নির্দেশনা ও তাগিদ দেয়া হয়েছে। হাদিসে এসেছে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। অগত্যা যদি রাস্তাঘাটে বসতেই হয়, তখন রাস্তার হক আদায় করবে। রাস্তার হক হলো- তোমরা তোমাদের চোখকে অবনত রাখবে, কাউকে কষ্ট দেবে না, কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।' (বুখারি)

হাদিসের নির্দেশনায় চোখ নিচু রাখার অর্থই হলো কোনো নারী যেন তার কুদৃষ্টির শিকার না হয়। নারীর প্রয়োজনে পথ চলায় যেন কোনো হয়রানির শিখার না হয়।

বিশেষ করে নারীর নিরাপদ পথচলায় করণীয় হলো-- কোনো নারীই ঘরের বাইরে উগ্র পদচারণা কিংবা চলাফেরা না করা। কোনো পর পুরুষের সঙ্গে আবেদনময়ী স্বরে কথা না বলা। ব্যক্তিগত পারিবারিক কিংবা চাকরির প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন রাস্তায় চলাফেরায় নম্র ও সতর্ক থাকতে হবে। অন্য পুরুষের (গায়রে মাহরাম) সঙ্গে আবেগ তথা দরদি স্বরে কথা না বলা সর্বোত্তম।

- সুস্থ সংস্কৃতি ও পারিবারিক বন্ধন, পরস্পরের প্রতি সঠিক মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখানোসহ সবক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা জরুরি। ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক শিক্ষাই উচ্ছৃঙ্খল ও বেহায়াপনামুক্ত সমাজ উপহার দিতে পারে।

- পর্দার সঙ্গে পথচলা নারীর জন্য সর্বোত্তম কাজ। পর্দার বাস্তবায়নই নারী-পুরুষের পথচলা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে পারে। নারীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত আর কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।

মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা নুর : আয়াত ৩১)

- এমনকি নবি পত্নীদের উদ্দেশ্য আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তাআলা বলেন-'হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও [ইহুদী খৃষ্টান)। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও তবে আকর্ষণধর্মী ভঙ্গিতে কথা বলনা, যাতে যাদের মাঝে যৌনলিপ্সা আছে তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং তোমরা স্বাভাবিক কথা বল। এবং তোমরা অবস্থান কর স্বীয় বসবাসের গৃহে, জাহেলি যুগের মেয়েদের মত নিজেদের প্রকাশ করো না।' (সুরা আহজাব : আয়াত ৩২)

সুতরং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা জরুরি। তবেই অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত থাকবে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র। নারী-পুরুষ উভয়েই থাকবে নিরাপদ।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে সমাজে 'নারী ও পুরুষ নির্যাত '-নামক কোনো শব্দই থাকবে না। তাই ব্যক্তি পরিবার কিংবা সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ উভয়ের শ্রদ্ধা ও সম্মানজন মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জাতীয় কবির ভাষায় বলতে হয়-'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআন-সুন্নাহর দিক-নির্দেশনা মেনে জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন। নারীর নিরাপদ পথচলায় ধর্মীয় অনুশাসনে নিজেদের পরিচালিত করার তাওফিক দান করুক।

# ১০.তাকদীরে যেহেতু লেখাই আছে তাহলে চেষ্টা- তদবিরের কি প্রয়োজন?,

## তাকদীরঃ

এক বিস্ময়কর আকিদার নাম তাকদীর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি বিশ্বাসী বান্দার জন্য এক অনন্য উপহার। অনেক মানুষ একে সঠিক ভাবে না বুঝার কারনে নানারকম বিভ্রান্তিতে পড়ে।

## তাকদীরের আকিদা যেন আমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারেঃ

ঘটনা ঘটার পূর্বে তাকদিরের আকিদা যেন। আমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। যেমনঃ তাকদীরের বাহানা ধরে দুই হাত গুটিয়ে বসে থাকা, কোন কাজকর্ম না করা, তাকদীরে যা আছে তাই হবে ভেবে বসে থাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর বিপরীত পথে চলার নাম তাকদির নয় বরং নির্দেশ হলো অর্জন ও উপার্জনের জন্য বৈধ পথে যতটুকু চেষ্টা করা দরকার ততটুকু করবে। চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখবে না এবং প্রচেষ্টার পর আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেবে।

তাকদীরের উপর আকিদা রাখার আমলটি শুরু হয় কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর।যেমন- কোন ঘটনা ঘটে গেলে একজন মু'মিনের চিন্তা হতে হবে এমন যে, আমার চেষ্টা আমি করেছি কিন্তু চেষ্টার বিপরীতে যদি কিছু ঘটে, যা ঘটেছে আল্লাহর হুকুমেই ঘটেছে। এতে আমি সন্তুষ্ট।

পক্ষান্তরে ঘটনা ঘটার পর যদি বলা হয় হায় যদি এভাবে না করে ওভাবে করতাম, তাহলে তো রক্ষা পেতাম! এইরূপ চিন্তা- চেতনাই মূলত আকিদা- বিশ্বাস ও তাকদীরের বিরোধী।

এই দুই চরমপন্থার মাঝে মধ্যম পন্থা হলো তাকদিরের বাহানা দেখিয়ে চেষ্টা ত্যাগ না করা। এবং চেষ্টার পরেও বিপরীত কিছু ঘটে গেলে তাকদীর এর উপরেই সন্তুষ্ট থাকা এই শিক্ষাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিয়েছেন।

ِالْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَة َ- 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের ভাগ্য লিখে রেখেছেন আকাশ সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে'।[4]

## তাকদীরের প্রকারভেদ :

তাকদীর সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। ১. অপরিবর্তনীয় (مبرم)। ২. পরিবর্তনশীল (معلق)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ِكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ ُوَجْهَه 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

প্রথম আয়াতে বলা হয় প্রত্যেক প্রাণীকেই মরতে হবে। ২য় আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত সকল জিনিসের ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। এতে কোন পরিবর্তন নেই। এটা অপরিবর্তনীয় ভাগ্য। ২য় বিষয় যে কোন প্রাণী কখন মরবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু আগে পরে হ'তে পারে। তাই ভাগ্যের কিছু অংশ পরিবর্তনশীল থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَمْحُو ِاللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب 'আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকটেই রয়েছে মূল কিতাব' *(রা'দ ১৩/৩৯)*।

এই আয়াতের তাফসীরে ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস বলেছেন, দু'টি কিতাব আছে। একটিতে কম-বেশী হয়ে থাকে। কারো দো'আ কিংবা ভাল-মন্দ কাজের কারণে ভাগ্যলিপিতে যে পরিবর্তন হয় সেটা কোন সময়ে বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্ত পাওয়া গেলে পরিবর্তন হবে, আর শর্ত না পাওয়া গেলে পরিবর্তন হবে না। ভাগ্য পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ُلاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاء 'আল্লাহর ফায়ছালাকে কোন বস্তু পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না দো'আ ব্যতীত'।[13] অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় ফায়ছালার পরিবর্তন করেন যখন বান্দা তাঁর নিকটে দো'আ করে। ছহীহ হাদীছে রয়েছে যে রক্ত সম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু বৃদ্ধি পায়। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ ُأَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه- 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার রূযী বৃদ্ধি হোক এবং তার আয়ু

দীর্ঘায়িত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।[14] উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দো'আ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে রিযক্ব ও আয়ু বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, আমরা আমাদের দোয়া এবং চেষ্টা চালিয়ে যাব ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকবো না। কারণ আমরা জানিনা আমাদের কোন দোয়া এবং কোন চেষ্টার ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভাগ্যে পরিবর্তন লিখে রেখেছেন।

**তাকদীর সঠিক ব্যাখ্যা: ওমর (রা:)এর ঘটনা -**

হযরত ওমর রা:একবার সিরিয়া যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে সংবাদ পেলেন সিরিয়ায় মারাত্মক মহামারী দেখা দিয়েছে  এ মরণব্যধি মহামারীতে হাজার হাজার সাহাবী শহীদ হয়ে যান জর্ডানে এইসব সাহাবীর কবর আজো বিদ্যমান। হযরত ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা: এর কবরও সেখানে অবস্থিত। যাই হোক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন সিরিয়ায় যাবেন  নাকি মদিনায় ফিরে যাবেন। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা:  একটি হাদিস শোনালেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহামারীতে আক্রান্ত এলাকার মানুষ যেন এলাকা ছেড়ে না যায় আর বহিরাগত মানুষ যেন আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ না করে।" এই হাদিস শোনার পর হযরত ওমর রা: বললেন -এই হাদিসে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না যাওয়ার সুতরাং আমি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা মুলতবি করলাম।

তখন এক সাহাবী সম্ভবত উবাইদা ইবনুল জাররাহ অমর রাঃ  কে বললেন -

"আপনি কি আল্লাহর তাকদীর ছেড়ে মদিনায় ফিরে যাচ্ছেন? আপনার মৃত্যু যদি এই মহামারিতে হয় তাহলে মৃত্যু আসবেই, আর যদি এর  মাধ্যমে আপনার মৃত্যু তাকদিরে না থাকে তাহলে তো যাওয়া না যাওয়া সমান।

হযরত ওমর রা:উত্তর দিলেন -

জি আমরা আল্লাহর (এক) তাকদির থেকে (আরেক)  তাকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি।

"

অর্থাৎ ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত সতর্কতামূলক তদবির করার জন্য আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। সতর্কতামূলক তদবির করা তাকদীরের পরিপন্থী নয় বরং এটাও তাকদীর আকিদারই অংশ। কারণ রাসূল সা: বলেছেন সতর্কতামূলক উপায় অবলম্বন কর। তাই আমি এই নির্দেশের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছি। এই মহামারিতে আমার মৃত্যু হলে কিছু করার নেই, তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে কোন বাধা নেই।

সুতরাং নিজের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আল্লাহর উপর সোপর্দ করতে হবে। আর এটার নামই তাকদীর। তকদির মানে হাত গুটিয়ে বসে থাকার নাম নয় বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপায় অবলম্বন। এটা তকদির পরিপন্থী নয়। সব উপায় অবলম্বন গ্রহণ করার পর যদি নিজেদের পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হয় তাহলে তা আল্লাহর ফায়সালা বলে সন্তুষ্ট মনে মেনে নেয়ার নামই তাকদীরের প্রতি ঈমান।

# ১১.চিন্তা ও পেরেশানী

## ভূমিকাঃ

ইসলামে দুশ্চিন্তা, মানসিক পেরেশানি বা অস্থিরতা অনুভব করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় এবং এটি সরাসরি ঈমান ভঙ্গের কারণ বা আল্লাহকে দোষারোপ (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে গণ্য হয় না, যদি না এর মাধ্যমে আল্লাহর তাকদিরের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ পায়। বরং মুমিনের জীবনে পরীক্ষা হিসেবে পেরেশানি আসতে পারে, যাকে সবর ও দোয়ার মাধ্যমে দূর করতে উৎসাহিত করা

## ১১.১চিন্তা পেরেশানি কি তাকদীরের খেলাফঃ

বুঝে নেওয়া উচিত দুঃখজনক কোন ঘটনা ঘটে গেলে এর জন্য কান্নাকাটি করা ধৈর্য পরিপন্থী নয় এবং এতে কোন গুনাহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা যখন বলছি দুঃখ কষ্টের অস্থির হওয়া এবং এর প্রকাশ করা জায়েজ। এবং জন্য কান্নাকাটি করাও জায়েজ। অপরদিকে বলছি আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহলে বিপরীতমুখী দুটো বিষয় একসঙ্গে হয় কিভাবে?

ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত, দুঃখ কষ্টে অস্থির হওয়া আর আল্লাহর ফায়সালার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া একই বিষয় নয়। কারণ আল্লাহ তাআলার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ফয়সালার উপর কোন অভিযোগ না করা। আল্লাহর ফায়সালা অবশ্যই হেকমত পূর্ণ ও রহস্য সমৃদ্ধ, যা আমরা জানিনা। আর আমরা জানি না বিধায় চিন্তা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে এবং এর জন্য কান্নাও আসছে একই সাথে আমরা এটাও জানি যে, আল্লাহর ফায়সালাই একমাত্র সঠিক ফায়সালা। সুতরাং উপর সন্তুষ্ট থাকা মানে  চিন্তার দিক থেকে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা অর্থাৎ কান্না এলেও দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে এরূপ যে, যা আল্লাহ ফায়সালা করেছেন তাই সঠিক।

## ১১.২চিন্তা পেরেশানি থেকে পরিত্রাণের উপায়ঃ

পার্থিব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে দুঃখ, দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানী। কারণ, দুনিয়া কষ্ট, মুসিবত ও সঙ্কটপূর্ণ স্থান। দুনিয়া এবং জান্নাতের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। জান্নাতে নেই কোন দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

'সেখানে তাদেরকক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।' ( সূরা হিজর : ৪৮)

জান্নাতবাসীদের অন্তর কখনো কলুষিত হবে না এবং কষ্টদায়ক কোন শব্দ তাদের কানে পৌঁছবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿25﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴿26﴾

'তারা সেখানে শুনতে পাবে না কোন বেহুদা কথা, এবং না পাপের কথা; শুধু এই বাণী ছাড়া, 'সালাম, সালাম।' ( সূরা ওয়াকেয়া : ২৫-২৬)

পক্ষান্তরে দুনিয়াবী জীবনের প্রকৃতি হচ্ছে, দুর্ভোগ, যন্ত্রণা ও অসচ্ছলতা। কী গরীব, কী ধনী; কী মুসলিম, কী অমুসলিম; সবাই এর ভুক্তভোগী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

'নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।' ( সূরা বালাদ : ৪)

মূলত মানুষ অতীত নিয়ে দুঃখিত, ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বর্তমান নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ইবনুল কাইয়ূম রামাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'অন্তরসমূহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর আধিক্য এবং স্থায়িত্বে ইমান-কুফর, আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিচারে দু'প্রকার। প্রথম প্রকার অন্তর রহমানের আরশ : এতে রয়েছে নূর ও হায়াত, আনন্দ ও বিনোদন, ঔজ্জ্বল্য ও কল্যাণের সবকিছু। দ্বিতীয় প্রকার অন্তর শয়তানের আরশ : এতে রয়েছে সংকীর্ণতা ও অন্ধকার, মৃত্যু ও পেরেশানী, দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা।'

কোরআন হাদিসের আলোকে চিন্তাও পেরেশানি থেকে মুক্তির কিছু উপায় আলোচনা করা হলো -

**১** . চিন্তা, পেরেশানী ও মুসিবত দূর করার জন্য বেশি বেশি দোয়া ও ইস্তেগফার করা এবং আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সপে দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"

‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।’ (সূরা গাফের : ৬০)

**২.** তদ্রূপ আল্লাহর জিকির ও কুরআন তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ” (الرعد: من الآية28)

‘জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।’ ( সূরা রাদ : ২৮)

কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا” (الإسراء:82

‘আর আমি কুরআন নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।’ (সূরা ইসরা : ৮২)

যারা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا” الأحزاب: من الآية35

‘আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।’ (সূরা আহযাব : ৩৫)

শয়তান চায় বান্দাদের আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল রাখতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ” المائدة:91

‘শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?’ ( সূরা মায়েদা : ৯১)

আর যে আল্লাহর জিকির থেকে দূরে থাকবে, তার দুঃখ-কষ্ট বেশিই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى”طـه:124

‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চিত এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কেয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।’ (সূরা তাহা : ১২৪)

কুরআন শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুমিনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

‘মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।’ (সূরা আনফাল : ২)

যাদের অন্তর আল্লাহর জিকির শূন্য তাদেরকে শাসিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ" الزمر:22

'আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন ফলে সে তার রবের পক্ষ থেকে নূরের ওপর রয়েছে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়?) অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে । তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।' ( সূরা যুমার : ২২)

**৩.**দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী মুক্ত হওয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যার জিকিরগুলো খুব যত্নের সঙ্গে পড়া। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

**৪.**গুনা থেকে দূরে থাকা, কারণ গুনা অন্তরে অশান্তি ও পেরেশানীর সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ * وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ" (الزخرف: 36 -39

'আর যে পরম করুণাময়ের জিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। আর নিশ্চয় তারাই (শয়তান) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়েত প্রাপ্ত। আর আজ তা {তোমাদের এই অনুতাপ} তোমাদের কোন উপকারেই আসবে না। যেহেতু তোমরা জুলুম করেছিলে। নিশ্চয় তোমরা আজাবে পরস্পর অংশীদার হয়ে থাকবে। অবশেষে যখন সে আমার নিকট আসবে তখন সে {তার শয়তান সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে} বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট সে সঙ্গী!' ( সূরা যুখরুফ : ৫৬-৩৯)

**৫.**উঁচু হিম্মত ও অন্তরে দুর্দান্ত সাহস রাখা। ছোট-খাট কোন বিষয় নিয়ে মাথা না ঘাবড়ানো। যেমন পারিবারিক বিষয় অথবা সামাজিক বিষয়। বরং সম্ভব হলে এগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করা এবং স্বীয় কাজ ও দায়িত্বের স্তূপ না করা।

**৬.**ধৈর্যধারণ করা ও সালাতে মগ্ন হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ" البقرة:45 .

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।' (সূরা বাকারা : ৪৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" البقرة:153

'হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা বাকারা : ১৫৩)

**৭.**একাকিত্ব ও নির্জনতা ত্যাগ করা। কারণ এ সময় শয়তান অধিক প্রবঞ্চনা দিয়ে থাকে।

**৮.** অবাস্তব জিনিস নিয়ে বেশি চিন্তা না করা। যেমন, কতক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ভাবা, যা বাস্তবায়ন করা খুবই কষ্টকর বা দুঃসাধ্য। বিশেষ করে ঘুমের সময়। আর চোখে ঘুম না থাকলে বিছানায় না যাওয়া। কারণ, এ পরিস্থিতি চিন্তা ও অন্তর ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, যার সূত্র ধরে চিন্তা ও পেরেশানীর জন্ম হয়।

**৯.**সৎ-সঙ্গ অন্বেষণ করা এবং আলেম ও বিজ্ঞজনদের মজলিসে অংশগ্রহণ করা।

**১০.** সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, আমানতদার ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী বন্ধু গ্রহণ করা, যে আপনাকে সাহায্য করবে, ভাল পথ দেখাবে এবং আপনার মুসিবত দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

**১১.** সম্ভাব্য ও সাধ্যের নিরিখে একটি বাস্তবধর্মী রুটিন তৈরি করা ও সে অনুসারে পরিচালিত হওয়া। এবং অবসর সময় কাটানোর জন্য পারিবারিক বা অন্য কোন আমল নির্দিষ্ট করে নেয়া।

**১২.** দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করার কিছু দোয়া নিম্নে উল্লেখ করা হল :

**(ক)** বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসিবতের সময় বলতেন :

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم

**(খ)** তিরমিজিতে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতেন : "سبحان الله العظيم" এবং খুব দোয়া করতেন ও বলতেন : يا حي يا قيوم

**(গ)** মুসনাদে আহমদে রয়েছে, ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বলেন, যে কোন বান্দার দুশ্চিন্তা বা পেরেশানী হলে, সে যদি এ দোয়া পড়ে,

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من

خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي. إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا".
আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে দেবেন আনন্দ।

সুতরাং চিন্তাও পেরেশানি থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পথ অনুসরণ করতে হবে তবেই মিলবে মুক্তি।

## ১২.আমার মনে কুমন্ত্রণা কেন আসে

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, যে মানুষকে ধোঁকা, ওয়াসওয়াসা (কুকমন্ত্রণা), মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, পাপ কাজকে সুশোভিত করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে বিভ্রান্ত করে । সে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং দারিদ্র্যের মিথ্যা ভয় ঢুকিয়ে দেয়।। তার কাজই হলো আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করা। তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা। আর তাছাড়া সে তো আল্লাহর সাথে শপথ করেই দুনিয়ায় এসেছে যে আদম সন্তানকে সে সবদিক থেকেই ধোকা দিবে।
যেমন কুরআনে এসেছে -

ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ

“তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’।”
(সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৭)

এ কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সে বহু ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি সংক্ষেপে লেখা হলো—

### ১২.১অপরাধকে সুশোভিত করে উপস্থাপনকরে :

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য অপরাধমূলক কাজগুলোকে সুশোভিত করে প্রদর্শন করে। ফলে মানুষ খুব উৎসাহ নিয়ে পাপের সাগরে সাঁতরাতে পছন্দ করে। আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের অপছন্দ করে আর শয়তানকে প্রকৃত অভিভাবক মনে করে।পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

“আল্লাহর শপথ, আমি তোমার আগে বহু জাতির নিকট রাসুল প্রেরণ করেছি। শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”
(সুরা : নাহল, আয়াত : ৬৩)

### ১২.২আড়ালে থেকে ষড়যন্ত্র করে :

মানুষের চোখের আড়ালে থেকে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানো শয়তানের অন্যতম কাজ। ইরশাদ হয়েছে-

“হে বনি আদম, শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদের দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখো না। নিশ্চয়ই আমি শয়তানদের তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না।”
(সুরা : আরাফ, আয়াত : ২৭)

### ১২.৩হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে ধোঁকা দেয় :

শয়তান মানুষকে হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে ধোঁকা দেয়।
সফলতার মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে বিপদে ফেলে দেয়। যেমন ধোঁকা দিয়েছিল আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

“অতঃপর শয়তান তাদের প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং সে বলল, তোমাদের রব তোমাদের কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে (খেলে) তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সে শপথ করে তাদের বলল, আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।”
(সুরা : আরাফ, আয়াত : ২০-২১)

### ১২.৪লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারিত করে :

সুকৌশলে মিথ্যা ও লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা শয়তানের অন্যতম কাজ। তার ফাঁদে যারা পা দেয়, তারা নিজেদের ইহকাল-পরকাল ধ্বংস করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

“সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।”
(সুরা : নিসা, আয়াত : ১২০)

### ১২.৫অশ্লীলতায় আগ্রহী করে :

শয়তান মানুষের মনে অশ্লীল কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে কাজ করে। সে তার দোসরদের দিয়ে মানুষের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়ায়। ইরশাদ হয়েছে-

“শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”
(সুরা : বাকারাহ,  আয়াত : ২৬৮)

## ১২.৬কুমন্ত্রণা দেয় :

শয়তান অনেক সময় আমাদের অন্তরের কুমন্ত্রণা দেয় যে, অমুকের তো এই সমস্যা নেই আমার কেন আছে? অমুকের তো অমুক জিনিসটা আছে আমার কেন নেই? আমার কত পেরেশানি, আমি কি এর জন্য উপযুক্ত ছিলাম? আমাকে কেন এত অনর্থক পেরেশানিতে জ্বলতে হবে?

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে। আমি আশঙ্কা করলাম যে সে তোমাদের মনে কিছু সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবে।
(বুখারি, হাদিস : ২০৩৮)

আমাদের মনে রাখা উচিত জীবনে যত দুঃখ কষ্টই আসুক না কেন আমরা যদি এটা মেনে নিতে পারি যে এই কষ্টটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এটা তারই ফায়সালা অতএব আমি এতে সন্তুষ্ট তাহলে এসব চিন্তা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা বরং সবর করার কারণে সাওয়াব পাবেন এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে অতএব সুফলি সুফল ক্ষতির কিছুই নেই।

অতএব দুনিয়াতে কষ্ট ভোগ করাই যখন সবার ভাগ্যলিপি তখন মানুষ ইচ্ছা করলে এই অবস্থায় সবারও করতে পারে আবার অধৈর্য এবং অস্থির হতে পারে তবে বান্দা যদি আল্লাহর ফয়সালায় এই বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যে কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আমি তাতে রাজি খুশি আছি।তাহলে মানুষ আল্লাহ তাআলার সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন -কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন -

قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

“বল, ‘হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর

যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই।"

(সূরা জুমার, আয়াত নং- ১০)

### ১২.৭সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে প্রপাগানড়ায় :

শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে প্রপাগান্ডা ছড়ায়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-

"তিনি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতামণ্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালা আলোচনা করেন। তখন শয়তানরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শুনেও ফেলে। অতঃপর তারা সেটা গণকের নিকট পৌঁছে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সঙ্গে নিজেদের আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে থাকে।"

(বুখারি, হাদিস : ৩২১০)

[ উপসংহার বাকি]

# ❁১৩.আধুনিক ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নানা দিক❁

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেনদেন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ঋণ কার্যক্রমে ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বহু কার্যক্রম ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে সুদভিত্তিক লেনদেন, অনিশ্চয়তা, জুয়াসদৃশ বিনিয়োগ এবং অসৎ উপায়ে মুনাফা অর্জনের মতো বিষয়গুলো ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুদকে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও অন্যায় ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই একজন সচেতন মুসলমানের জন্য আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে ইসলামের মূল বিরোধের জায়গাগুলো মূলত সুদ (রিবা), অর্থের সময়মূল্য ও ফটকাবাজি (ঘারার), জুয়া (মাইসির) এবং অনৈতিক খাতে বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামী অর্থনীতি ও ফিকাহশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে দিকগুলো সাংঘর্ষিক, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

### ❁১. সুদ বা রিবা (Riba):

ব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের একাউন্ট আছে যেমন:কারেন্ট একাউন্ট, সেভিংস বা সঞ্চয়ী,ডিপিএস ইত্যাদি।

সেভিংসের সুদ নেওয়া জায়েজ নাকি নাজায়েজ তা জানার আগে যে ব্যাংকে টাকা রাখবো ,আমাদের টাকা দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড গুলো একটু আলোচনা করা যাক।

লোকেরা যে ব্যাংকে টাকা রাখেন সেই টাকা ব্যাংক বিভিন্ন কাজে বিনোয়োগ করে, লোন দেয় আর এই থেকে যতটুকু লাভ হয়, তার থেকে কিছু অংশ আনুপাতিক হারে লোকদের কাছে মুনাফা বা সুদ দিয়ে থাকেন।এখানে,ব্যাংক যদি শুধু বিভিন্ন ধরনের দেশ উন্নয়নমুলক কাজ তথা বিভিন্ন শিল্প কারখানা,খামার,কৃষিকাজ ইত্যাদিতে টাকা বিনিয়োগ করে তার থেকে প্রাপ্ত লাভ লোকদের দিয়ে থাকে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।কিন্তু ব্যাংক শুধু উৎপাদনমুলক এই কাজগুলু করে না বরং। লোন নামে

সুদের কারবারি ও করে থাকে অর্থাৎ ব্যাংকে আমরা যে টাকা। রাখি তা দিয়ে সুদি কাজ করা হয়। এখন,সুদ কি? সুদ দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধে ইসলামের বিধান কি? সেই সম্পর্কে জানলে তবেই আপনার উত্তরটা বুঝা সহজ হবে।
ইসলামি পরিভাষায়, কেউ অন্য কাউকে টাকা দিলে টাকা রিটার্ন নেওয়ার সময় যদি তার থেকে বেশি টাকা নেয় তাহলে তাকে সুদ বলে।
রাসুল (স) বলেছেন,"সুদ দেওয়া ও নেওয়া সমান অপরাধী"।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।”
*[৪]. মুসলিম : ৭৫৯৭*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বিদায় হজে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- ‘মনে রেখ জাহিলি যুগের সকল সুদ ভিত্তিহীন। তোমাদের জন্য শুধুই মূলধন। তোমরা জুলুম করবেও না এবং সইবেও না।’
*[আবু দাউদ : ৩৩৩৪]*

অর্থাৎ সুদ খেলে যেমন গুণাহ হবে দিলে ও তার সমান গুণাহ হবে। তাছাড়া সুদি কারবারে সাহায্য করা, সুদলেখক, সুদ সাক্ষীদাতা উভয়ই সমান অপরাধী। এখন, আপনি যদি সুদখোর কোনো ব্যাংকে টাকা রাখেন তার মানে আপনি সুদখোরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। তাছাড়া, ব্যাংক আমাদের সুদের কিছু অংশ দিয়ে থাকে, অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা সুদ খেয়ে থাকি। তাই কোন অনৈসলামিক ব্যাংক যেগুলু সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোতে সেভিংস সহ কোনো টাকা রাখা জায়েজ নেই।
হাদিসে এসেছে-প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন, রাসূল সা: বলেছেন,
" তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তাদের উপর আল্লাহর লানত এবং এ অপরাধের ক্ষেত্রে সবাই সমান।”
( সহীহ বূখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ হারাম। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো সুদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাংকগুলো আমানতদাতাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়ে অর্থ গ্রহণ করে এবং সেই অর্থ অধিক সুদে ঋণ বা বিনিয়োগ করে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, ঋণ দিয়ে সময়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা সুস্পষ্ট সুদ।

### ❁২. অর্থের বিনিময়ে অর্থের ব্যবসা (Money as a commodity):

ইসলামে অর্থ বা মুদ্রাকে কোনো বিক্রয়যোগ্য পণ্য বা নিজে থেকে মুনাফা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; বরং এটি কেবল একটি বিনিময় মাধ্যম। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় টাকা দিয়ে টাকা কেনাবেচা করা হয়, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়।

জরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণে (হাতে-হাতে) বিক্রি করবে। তবে যদি এগুলোর ধরন ও শ্রেণি ভিন্ন হয়, তাহলে যেভাবে ইচ্ছা বেচাকেনা করতে পারো, যদি তা হাতে-হাতে হয়।" (সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ টাকার বিনিময় টাকাও এই হাদিসের অন্তর্ভুক্তই হবে যার কারণে এই পদ্ধতিটিও সসম্পূর্ণ হারাম

### ❁৩. ঝুঁকিহীন মুনাফা (Guaranteed Return):

ইসলামের মূল অর্থনৈতিক দর্শন হলো, "লাভ যেমন অধিকার রাখে, লোকসানও সেভাবে বহন করতে হবে" (Profit and Loss Sharing)। প্রচলিত ব্যাংকে ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ে লাভ করুক বা লোকসান করুক, ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করবেই। এই একতরফা ও ঝুঁকিহীন মুনাফা অর্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। যেখানে ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে কেবল অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। ইসলামে এটি একটি জুলুম ও অন্যায় ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত।

### ❁৪. অতিরিক্ত চার্জ ও জরিমানা (Riba-al-Jahiliyyah):

কোনো গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে, ব্যাংক তার ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে অতিরিক্ত সুদ বা জরিমানা (Late Payment Fee) আরোপ করে। ইসলামে এই ধরনের ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা সরাসরি সুদ বা রিবা হিসেবে গণ্য হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।”

( সূরা আল ইমরান- ১৩০)

### ❁৫. ফাটকাবাজি ও জুয়া (Gharar & Maysir):

আধুনিক ব্যাংকিং ও শেয়ার বাজারের বিভিন্ন জটিল আর্থিক ডেরিভেটিভস, যেমন—ফিউচার (Futures), অপশন (Options), এবং স্পেকুলেটিভ ট্রেডিংয়ে অস্পষ্টতা এবং অনিশ্চয়তা থাকে। এ ধরনের লেনদেন ইসলামে জুয়া (মাইসির) ও ফটকাবাজি (ঘারার) হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তা হারাম।

### ❁৬. নিষিদ্ধ খাতে বিনিয়োগ:

প্রচলিত ব্যাংকগুলো সাধারণত গ্রাহকের ব্যবসার ধরন বা সামাজিক প্রভাব বিবেচনা না করে কেবল মুনাফার দিকে নজর দেয়। ফলে তারা মদ, জুয়া, শুকরের মাংস উৎপাদন, তামাক বা ইসলামে নিষিদ্ধ এমন অনেক ব্যবসায় সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ঋণ ও বিনিয়োগ প্রদান করে।

### ❁৭. ক্রেডিট কার্ড ও বিলম্ব ফি:

প্রচলিত ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থায় বিল পরিশোধে সামান্য দেরি হলেই উচ্চহারে সুদ (Interest/Finance Charge) কাটা হয়, যা সুস্পষ্ট সুদের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কার্ডধারী যা কেনাকাটা করে থাকে তা গ্রাহকের পক্ষে তার ব্যাংক বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয়। পরে গ্রাহক সে বিল ব্যাংককে পরিশোধ করে।

এখানে বিল পরিশোধের দুইটি সময় থাকে। একটি হলো, মিনিমাম ডিউ। এ সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধ করলে গ্রাহককে অতিরিক্ত কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হয় না। ওই সময় পার হলে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, একজন মুসলিম

ক্রেডিটকার্ডধারী ওই শর্তে বা চুক্তিতে ক্রেডিট কার্ড নেয়ার সময় যদি নিয়তে রাখে যে, মিনিমাম ডিউর আগেই বিল পরিশোধ করে দেবে, তবে কি ওই নিয়তে তা নেয়া জায়েজ হবে? এ প্রশ্নটি ক্রেডিট কার্ড বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মূলত এ প্রশ্নের উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের বৈধতা ও অবৈধতা।

এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য মতামত হলো— ওই চুক্তিতে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ জায়েজ নয়। কারণ, ওই শর্ত মেনে দস্তখত করার অর্থ একটি সুদি চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। চুক্তিটিই হারাম ও সুদি চুক্তি। কোনো লেনদেন হালাল-হারাম হওয়ার মূল বুনিয়াদ হলো মূল চুক্তিনামা, যা উভয়পক্ষের মাঝে আলোচনা হয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ক্রেডিট কার্ডধারী পরে নিজেকে সুদ থেকে বাঁচালেও সে এমন এক চুক্তির সঙ্গে একমত হয়েছে, যা সুদি লেনদেন।

তাছাড়া এটিও একটি বাস্তবতা যে, বর্তমানে ৯৫ শতাংশ বা তারও বেশি ক্রেডিট কার্ডধারী সুদি কারবারে লিপ্ত। তাই এ চুক্তিতে জড়ানো যাবে না। যদিও উক্ত সুদি শর্ত নিজের ওপর বাস্তবায়নের নিয়ত না থাকে। যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে তো দ্বিগুণ গোনাহ। আর বাস্তবায়ন না হলেও সুদি চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার গোনাহ তো আছেই। বর্তমান ফকিহদের অধিকাংশের রায় এটিই। প্রায় সবক'টি আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

### ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকল্প কিছু ব্যাংকিং ব্যবস্থা :

এই অসামঞ্জস্যতাগুলো দূর করতে আধুনিক অর্থনীতিতে শরিয়াহ-ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে , যা সুদের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব (মুদারাবা, মুশারাকা), ক্রয়-বিক্রয় (মুরাবাহা) এবং ইজারা (Ijarah) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। ইসলামিক শরীয়াহ সম্মত সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থাগুলো মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। নিচে প্রসিদ্ধ কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

**১. মুদারাবা (Mudarabah):** এটি একটি অংশীদারিত্বভিত্তিক চুক্তি, যেখানে একজন পুঁজি প্রদানকারী (রব্বুল মাল) এবং অন্যজন শ্রম ও দক্ষতা প্রদানকারী (মুদারিব) থাকে। লাভ নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করা হয়, কিন্তু ক্ষতি শুধু পুঁজি প্রদানকারী বহন করে, যদি না মুদারিবের গাফিলতি বা প্রতারণা থাকে। (সূত্র: হিদায়া, কিতাবুল মুদারাবা)

❁২. **মুশারাকা (Musharakah):** এটি একটি যৌথ অংশীদারিত্ব, যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ অর্থ ও শ্রম উভয়ই প্রদান করে এবং লাভ-ক্ষতি নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করে নেয়। (সূত্র: হিদায়া,)

❁৩. **বাই' মুআজ্জাল (Bai' Muajjal):** এটি একটি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, যেখানে ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে। এখানে পণ্যের মূল্য সময় বাড়ানোর কারণে কিছু বাড়তি হতে পারে, তবে এটি সুদ নয় বরং একটি বৈধ বাণিজ্যিক লেনদেন। (সূত্র: আল-মাবসূত, সারাখসী,)

❁৪. **ইজারা (Ijarah):** এটি একটি ভাড়া বা লিজ পদ্ধতি। ব্যাংক কোনো সম্পদ ক্রয় করে গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়ায় দেয় এবং ভাড়ার অর্থ কিস্তিতে আদায় করে। (সূত্র: হিদায়া, কিতাবুল ইজারা;

❁৫. **মুরাবাহা (Murabahah):** এটি একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, যেখানে ব্যাংক প্রথমে পণ্য ক্রয় করে, তারপর নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে। মুনাফার হার ও মূল্য আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। (সূত্র: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭৯;

❁৬. **সালাম (Salam):** এটি একটি অগ্রিম ক্রয় পদ্ধতি, যেখানে পণ্যের মূল্য আগেই পরিশোধ করা হয় এবং পণ্য ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা হয়। (সূত্র: হিদায়া, কিতাবুস সালাম)

❁৭. **ইসতিসনা (Istisna):** এটি একটি উৎপাদন সংক্রান্ত চুক্তি, যেখানে কোনো জিনিস তৈরির অর্ডার দেওয়া হয় এবং মূল্য কিস্তিতে বা পরে দেওয়া যায়। (সূত্র: আল-মাবসূত, সারাখসী, ১২/১৩৮;

**৮. কারদে হাসানা (Qardh-e-Hasana):** এটি একটি সুদবিহীন উত্তম ঋণ, যেখানে ব্যাংক কোনো বাড়তি লাভ ছাড়াই শুধুমাত্র মূল টাকা ফেরত নেয়। (সূত্র: কুরআন, সূরা বাকারা, ২:২৪৫;

এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমেই ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত লেনদেন সম্পাদন করে। প্রতিটি পদ্ধতি শরীয়াহ নীতি অনুযায়ী বৈধ এবং এগুলোতে কোনো সুদ (রিবা) নেই।

## ১৪.বর্তমান চিকিৎসা ব্যাবস্থায় কিছু সমস্যা এবং তার ইসলামি সমাধান

বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানবসেবার পাশাপাশি কিছু অনৈতিকতা ও দুর্নীতিও দেখা যায়, যা সমাজে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। ইসলাম চিকিৎসাকে ইবাদত ও মানবসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখেছে। তাই চিকিৎসাক্ষেত্রে সততা, ন্যায়নীতি ও মানবিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছু অনৈতিকতা-

**১. অতিরিক্ত অর্থলোভ ও বাণিজ্যিক মনোভাবঃ**

অনেক ক্ষেত্রে রোগীর সেবার চেয়ে অর্থ উপার্জনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, অপারেশন বা ওষুধ দেওয়া হয়। যা রোগীর পক্ষে বহন করার দুঃসাধ্য

**২. ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধঃ**

সামান্য কিছু অর্থের লোভে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী  নকল বা মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বাজারজাত করে, যা মানুষের জীবনের জন্য হুমকি।

### ❁৩. রোগীর সাথে প্রতারণাঃ

কখনো কখনো ভুল রিপোর্ট দিয়ে রোগীর আসল সমস্যা গোপন করে অপ্রয়োজনীয় ভয় দেখিয়ে  টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যার ফলে কিছু সময় রোগী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যায়।

### ❁৪. কমিশন বাণিজ্যঃ

সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠছে নামে-বেনামে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সেই সঙ্গে কমিশন বাণিজ্যে ক্রমাগত বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়। এক শ্রেণির নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অর্থলোভী চিকিৎসক বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির সঙ্গে গোপন চুক্তিতে রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর কমিশন গ্রহণ করছে। অভিযোগ রয়েছে, কমিশনের লোভে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষারও করাচ্ছেন। এমনকি নিজের পছন্দের প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে আনতে বাধ্য করছেন তারা। এছাড়া ঔষধ কোম্পানি গুলোর সাথেও রয়েছে ডাক্তারদের বানিজ্যিক সম্পর্ক।এমনও ডাক্তার আছে এদেশে যাদের চেম্বারে রোগীর চেয়ে ঔষধ কোম্পানির বিজ্ঞাপনকারীদের ভীড় থাকে বেশি।  স্বাস্থ্য সেক্টরে কমিশন বাণিজ্যের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট হলেও এটি বন্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিংবা স্বাস্থ্য অধিদফতরের কার্যকর কোনো পদক্ষেপই নেই।

### ❁৫. অবহেলা ও দায়িত্বহীনতাঃ

ভুল চিকিৎসা কিংবা চিকিৎসায় অবহেলায় রোগীর মৃত্যু বা অপূরণীয় ক্ষতিসাধনের অভিযোগ বাংলাদেশে নতুন নয়। এরকম অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রায়ই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রোগীর স্বজনদের বাদানুবাদ, ভাঙচুর এমনকী মারামারির খবর পাওয়া যায়। চিকিৎসায় অবহেলা বলতে শুধু চিকিৎসকের অবহেলা নয় বরং চিকিৎসাসেবা–সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যেমন নার্স, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন ও সরবরাহকারীদের অবহেলাও বোঝানো হয়।

### ❁৬. গোপনীয়তা রক্ষা না করাঃ

রোগীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা ইসলামের দৃষ্টিতে আমানতের খিয়ানত।
বর্তমান চিকিৎসা খাতে রোগীদের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের নানা দিক আজ সমাজে উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা হলো মানুষের জীবন, সম্মান ও ব্যক্তিগত তথ্যের সাথে জড়িত একটি সংবেদনশীল বিষয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অনুমতি ছাড়াই তার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা হয়, যা নৈতিকতা ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। অনেক সময় রোগীর অনুমতি ছাড়াই অপারেশন থিয়েটার, বেড বা চিকিৎসাধীন অবস্থার ছবি ও ভিডিও ফেসবুক বা অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এটি রোগীর মর্যাদার লঙ্ঘন।

### ❁৭. গরিব রোগীর প্রতি বৈষম্যঃ

অর্থহীন মানুষ অনেক সময় সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন যেন ধনীদের বিলাসিতা, আর গরিবের জন্য এক প্রকার প্রহসন। সংবিধানে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাস্তব চিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশের বহু মানুষ এখনও ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য এই ব্যবস্থাটি যেন মৃত্যু আর অসহায়ত্বের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এদেশে গরিবের বাঁচা মরা দুইই সমান।

## ❁ চিকিৎসা ক্ষাতে এহেন পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের উপায় ❁

### ❁ ১. সততা ও তাকওয়া অবলম্বনঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন—
“তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।”
(সূরা আন নিসা, আয়াত-১৩৫)

চিকিৎসকদের উচিত আল্লাহভীতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করা। চিকিৎসা কে কেবল পেশা নয় বরং মানব সেবা একটা ইবাদত মনে করে দ্বায়িত্ব পালন করা । রাসূল ﷺ বলেছেন—

“মানুষের মধ্যে সেই উত্তম, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে।”

অতএব, মুহাম্মাদ সা:এর এই শিক্ষা চিকিৎসকদের মানবিক হতে উৎসাহ দেয়। নিষ্ঠুর হতে নয়।

### ❁ ৩. প্রতারণা ও দুর্নীতি বর্জনঃ

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”
(সহি মুসলিম)
অতএব কমিশন, ভেজাল ও মিথ্যা রিপোর্ট ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

### ❁ ৪. রোগীর হক আদায় করাঃ

ইসলামে প্রতিটি মানুষের জীবন মূল্যবান। আল্লাহ বলেন—
“যে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করল।”
(সূর মায়েদা, আয়াত-৩২)

এ আয়াত চিকিৎসা পেশার মর্যাদা ও দায়িত্বকে স্পষ্ট করে।

### ❁৫. আমানতদারিতা ও গোপনীয়তা রক্ষাঃ

রোগীর তথ্য গোপন রাখা ‘ আমানত রক্ষা করার অন্তর্ভুক্ত।
আল্লাহ বলেন—
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন আমানত যথাযথভাবে আদায় করতে।”
(সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৮)

রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মানুষের দোষ গোপন করবে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন রাখবেন।”
(সুনানে আবু দাউদ-৪৮৯৩)।
যেখানে দোষকে গোপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে দোষ নয় বরং বাধ্য হয়ে চিকিৎসার স্বার্থে নিজের কোনো বিষয় চিকিৎসকের সামনে প্রকাশ করলো আর ডাক্তার সাহেব তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাকে সামাজিকভাবে হেয় করলো তাহলে এর কি কোনো বিচার হবে না?

### ❁৬. গরিব ও অসহায়ের প্রতি সহানুভূতিঃ

রাসূল ﷺ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়েছেন। চিকিৎসকদের উচিত আর্থিক অবস্থার কারণে কাউকে অবহেলা না করা। আবার কাউকে প্রয়োজনের অধিক সুবিধা না দেওয়া।

**❁৭.রোগীর প্রতি সম্মান দেখানো:** রোগীর প্রতি ডাক্তারের যে দায়িত্ব রয়েছে, এর অন্যতম হচ্ছে রোগীকে সম্মান দেখানো। আর প্রত্যেক বিষয়ের সম্মান দেখানোর পদ্ধতি আল্লাদা আলাদা। এক্ষেত্রে সম্মান দেখানোর বিষয় হলো, রোগীর অভিযোগ ও তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনা। তার রোগ বা তাকে নিয়ে বিদ্রুপাত্বক কোনো কথা না বলা। রোগীর প্রতি কোনোরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করা। অনেক সময় রোগীর জ্ঞানগত যোগ্যতা বা সামাজিক অবস্থান নিচু হওয়ার কারণে অবজ্ঞা করা হয়। এটা

কোনোভাবেই কাম্য নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার হচ্ছে তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলা। আল কোরআনে বলা হয়েছে,

"আর মানুষের দিক থেকে অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে দম্ভ করে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" ।

রোগী, ডাক্তারের খোশকথা দ্বারা উৎফুল্ল হয়ে অনেক সময় প্রশান্তি অনুভব করে। এটাও রোগীর ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হয়। তাই রোগীকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হবে। সওয়াবের পাল্লায় এই কথাও শামিল হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন- "ভালো ভালো কথা বলাও সদকার অন্তর্ভূক্ত।" (মুসনাদে আহমদ-৮১১১)।

**৮.রোগীর দৃষ্টিতে রোগ দেখা:** সমানুভূতি নিয়ে রোগী দেখা। অর্থাৎ রোগী, রোগের কারণে মানসিক ও শারীরিক যতটুকু পেরেশানিতে আছে, এর অনুভূতি ডাক্তারের মাঝে থাকা। একজন ডাক্তারের কাছে রোগী কী প্রত্যাশা করে, সে অনুযায়ী ডাক্তারের রোগীর প্রতি খেয়াল করা। এ জন্য, কোনো রোগী সরাসরি ডাক্তারের সাক্ষাতে এলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো। এ ব্যাপারে কোনো গাফলতি হলে, রোগীর সমস্যা বুঝার ক্ষেত্রে ডাক্তারের অনুভূতি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। (বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলতে হয় না। এক শ্রেণীর অসাধু ডাক্তার, পয়সা কামানোর লোভে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের পরীক্ষার কথা লিখে দেয়)।

**৯.রোগীর কল্যাণ কামনা ও লাভজনক দিককে প্রাধান্য দান:** রোগীর অবস্থা বিবেচনায়, তার সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভূমিকা অগ্রগন্য। সাধারণ মানুষের ভূমিকা এক্ষেত্রে অন্ধের মতো। তাই ডাক্তারকে আমানতদারি রক্ষা করে চলতে হবে। কোনো কিছু ঠিক করে দেয়ার আগে, চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে এর কার্যকারিতা ও প্রায়োগিক দিকগুলো ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। অপ্রচলিত, অগ্রহণযোগ্য কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মানহীন কোম্পানির ওষুধ, শুধু কমিশনের লোভে দিলে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে এটা হবে এক ধরনের বেঈমানি।

**১০.নিম্মোক্ত বিষয়গুলোও রোগীর কল্যাণ কামনার অন্তর্ভূক্ত হবে-**

**(এক)** লিখিত চিকিৎসা পত্র দেয়া। লেখা হবে স্পষ্ট অক্ষরে (আমাদের দেশে অনেকে প্রেসক্রিপশন দেন, যা ফার্মেসিতে নিয়ে যাওয়ার পর পড়া যায় না। এটা কোনো দায়িত্বশীল ডাক্তারের কাজ হতে পারে না)। সেখানে ওষুধের পরিমাণ, ব্যবহারের পদ্ধতি, চিকিৎসা গ্রহণের সময় যে সব বিষয় পরিহার করে চলতে হবে ও ওষুধ

ব্যবহারের ফলে সাময়িক যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

" কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি মুমিন হতে পারে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ করে না।"। (সহিহ বোখারী-১৩)।

**(দুই)** রোগ এমন হলে, যা থেকে নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই তাহলে দায়িত্ব হচ্ছে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকে সেবা দিয়ে যাওয়া।

**(তিন)** যে বিষয় নিয়ে পড়া-লেখা হয়েছে, ওই বিষয়ের কোনো রোগী এলে চিকিৎসা দিতে কোনো কার্পণ্য না করা। বরং সামর্থ্যের সর্ব্বোচ্চটা ব্যয় করা। যদি নিজের দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে কাছের কোনো হাসপাতালে রেফার করা। মনে রাখতে হবে, একজন মানুষের জীবনের মূল্য জগতের কোনো বস্তু হতে পারে না। তাই অবহেলার কারণে কেউ মারা গেলে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আল্লাহ যেমন অনুগ্রহ করে আমাকে ডাক্তার বানিয়েছেন, আমারও কর্তব্য হলো মানুষের ওপর ইহসান করা।

**(চার)** রোগীর সার্জারি বা অপারেশন উপযুক্ত স্থানে করা। অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটারেই অপারেশন করা। এমন যেন না হয়, অপারেশনের জন্য পর্যাপ্ত যোগান নেই, তারপরও অপারেশন শুরু হয়ে গেলো। এটা হবে মানুষ ও মানবতার প্রতি চরম অবহেলা।

**(পাঁচ)** রিলিজ দেয়ার উপযুক্ত সময় আসার আগে রিলিজ না দেয়া। তবে শারীরিক অবস্থা যদি উন্নত মনে হয় যে, রিলিজ দিলে কোনো সমস্যা হবে না। অনেক অসাধু মেডিকেল কর্তৃপক্ষ টাকার নেশায় সময় পার হয়ে গেলেও রিলিজ দিতে চায় না। আবার অনেক সরকারি হাসপাতাল সময়ের আগেই বের করে দেয়। উভয়টা মানবতার প্রতি চরম অবহেলা।

### ❁১১.রোগী চিকিৎসা করাতে অনীহা প্রকাশ করলে চিকিৎসকের করণীয়:

রুগী চিকিৎসা না করলে ভবিষ্যতে কী কী সমস্যা হতে পারে তা রোগীকে বুঝানো। রোগ বিস্তারের ভয়াবহ দিকগুলো তার সামনে তুলে ধরা। তবে এক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত হয় এমন কিছু না বলা। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, রোগীর অনুমতি নিয়ে চিকিৎসা করা। তবে রোগ যদি সাধারণের জন্য ঝুঁকির কারণ হওয়ার মতো হয় তাহলে বিশেষ কারণে অনুমতি ছাড়াই চিকিৎসা হতে পারে। রোগীর মৌখিক সম্মতিও অনুমতি হিসেবে ধর্তব্য হবে। কোনো চিকিৎসা গ্রহণে রোগী অনীহা প্রকাশ করলে, যদি এর বিকল্প থাকে তাহলে চিকিৎসকের দায়িত্ব হলো তাকে বিকল্পটা বলে দেয়া। একটার মধ্যে আটকে রেখে মানসিক চাপে ফেলা উচিত নয়।

**❁১২. সংক্রামক রোগের রোগী হলে চিকিৎসকের করণীয়:** রোগ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কারো শরীর থেকে অন্যের শরীরে সংক্রমতি হতে পারে না। আল্লাহর নির্দেশে কোনো কোনো রোগ একজন থেকে আরেক জনের মাঝে ছড়াতে পারে। তাই এমন রোগ হলে যা ছড়ানোর আশংকা আছে চিকিৎসকের দায়িত্ব হলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রোগ নিয়ন্ত্রনে যারা কাজ করে তাদেরকে জানানো।

**❁১৩.অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা চিকিৎসা না দেওয়াঃ** বাড়ী বানাতে ভুল করলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা আছে। বিচারক আদালতে রায় ভুল দিলে উচ্চ আদালতে তা সংশোধন হয়ে যাবে। কিন্তু চিকিৎসায় ভুল করলে তা সংশোধনের সুযোগ নেই। এখানে মানুষের জীবন মরনের প্রশ্ন। তাই কোনো অসম্পূর্ণতা নিয়ে রোগী দেখা নয়। যার জন্য সম্পদের যতটুকু হিস্সা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সে তা পাবেই। তাই চিকিৎসাকে অর্থ কামানোর মাকসাদ না বানানো। মানব সেবার নিয়তে চিকিৎসা সেবা দিলে এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি মিলবে। তাই একজন ডাক্তারের উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

**❁১৪.চিকিৎসকের উচিত মানবদেহের নিত্যনতুন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করাঃ**
ডাক্তারদের কাজের মাঝে এটাও অন্তর্ভূক্ত যে, তারা রোগ কমানোর জন্য ফিকির করবে। মানুষের শিক্ষার কোনো শেষ নেই। বিশেষ করে চিকিৎসার ময়দানে। প্রত্যেক দিন মানব দেহে নতুন নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। তাই প্রত্যেক ডাক্তারের কর্তব্য হচ্ছে নতুন নতুন বিষয় শিখার চেষ্টা করা। কোনো কোনো ডাক্তার রোগী দেখাতেই ব্যস্ত থেকে সময় পার করে দেন। তারা শিখার সুযোগ পান না বা এর জন্য সময় দিতে চান না। এটা কোনো সৃজনশীল মানুষের কর্মপন্থা

# উপসংহার

চিকিৎসা পেশা শুধু উপার্জনের মাধ্যম নয়; এটি মানবতার সেবা ও মহান দায়িত্ব। বর্তমান চিকিৎসাক্ষেত্রের অনৈতিকতা দূর করতে হলে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণ, আল্লাহভীতি, সততা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যখন চিকিৎসক, রোগী ও সমাজ সবাই ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মেনে চলবে, তখন চিকিৎসা ব্যবস্থা হবে আরও নিরাপদ, ন্যায়ভিত্তিক ও